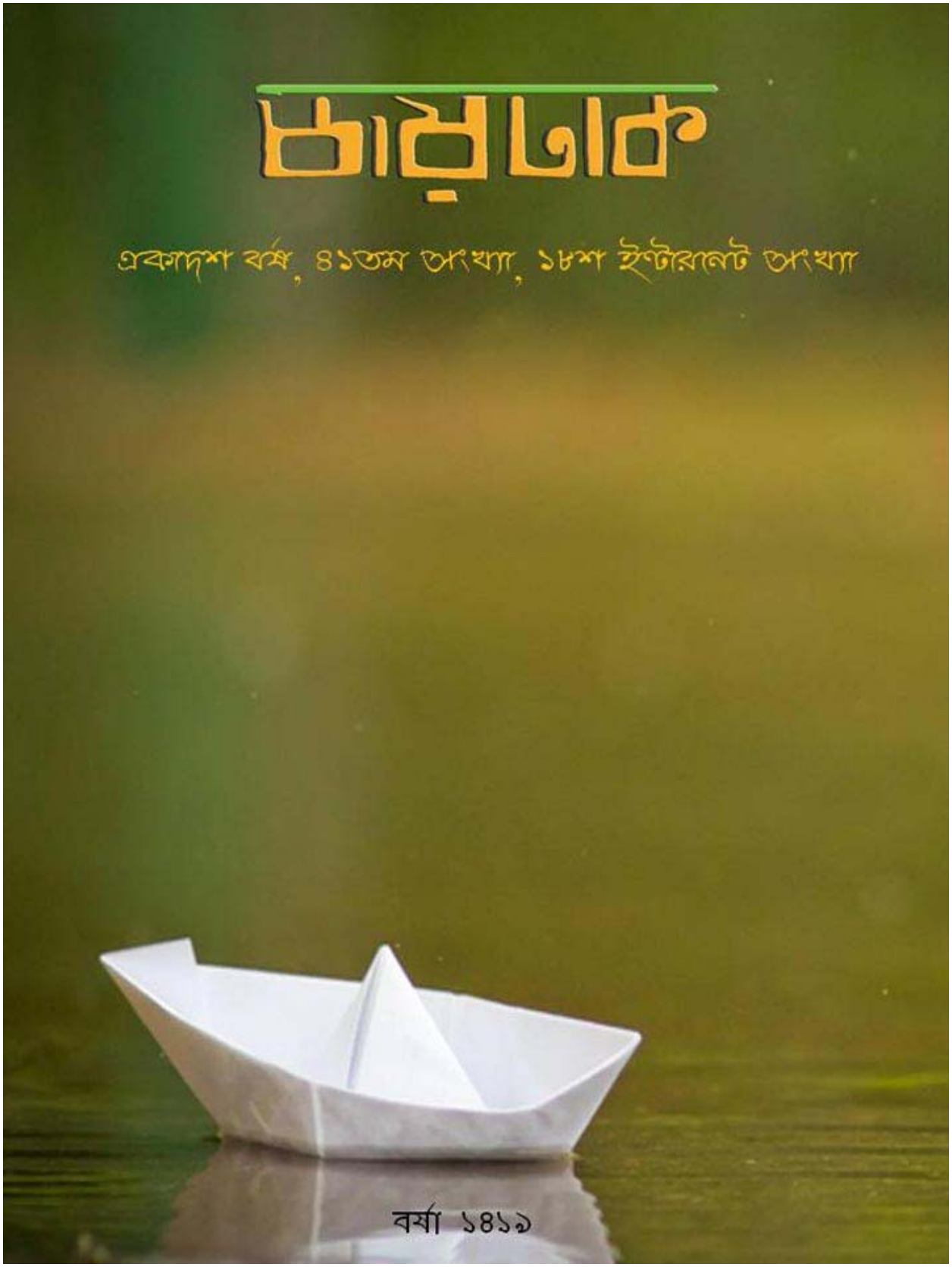

একাদশ বর্ষ, ৪১তম সংখ্যা, ১৮শ ইন্টারনেট সংখ্যা
বর্ষা ১৪১৯

সূচিপত্র

	বিষয়	লেখা		লেখক	ছবি/গ্রাফিক্স	পাতা
১	মলাট				দেবজ্যোতি	
২	জয়ঢাকের দলবল				দেবজ্যোতি	৪
৩	আমাদের কথা				দেবজ্যোতি	৫
৪	সম্পাদকীয়	জয়ঢাকি বোল		দেবজ্যোতি	দেবজ্যোতি	৭
৫	কমিক্স	বিল্লিগুলো		দেবজ্যোতি	মৌসুমী	৮
		মামি ফিরে আসবেই		মুকুট	মুকুট/ইন্দ্রশেখর	১১
	গল্প	(ক)	আক্রমের কথা	চিঙ্কুমারী সিং	অনুপম	২২
৬		(খ)	বিশ্ববাবুর বিশ্ব	সৌম্যদীপ বিশ্বাস	সংগৃহীত	২৭
		(গ)	মাধুর কথা	তাপসকিরণ রায়	অনুপম	৩৬
		(ঘ)	খোলা জানালা	সাকি{এইচ এইচ মুনরো} (অনুঃ অমিত দেবনাথ)	দীপংকর ও সংগৃহীত	৪৩
		(ঙ)	মালখাম্ব	সৌরভ রায়	মৌসুমী	৪৮
৭	ভ্রমণ	পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো		ইন্দ্রনাথ	মৌসুমী/সংগৃহীত	৫৪
৮	বিচিত্র দুনিয়া	অজানা দুর্গ দালিং		অরিন্দম দেবনাথ	সংগৃহীত	৬০
৯	বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	~~(ক)~~	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত	৬৩
		(খ)	ভারতের বৈজ্ঞানিক	টুপুর	সংগৃহীত	৬৭
		(গ)	বিচিত্র জীবজগত	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত	৬৯
		(ঘ)	টেকনো টুকটাক	বৈজ্ঞানিক	সংগৃহীত	৭২
	বনের ডায়েরি	(ক)	বালরীগ্রামের বাঘ	জে জে দত্ত	মৌসুমী	৭৩
		(খ)	ভারতের বনাঞ্চল	সংহিতা	সংগৃহীত	৭৭
১০	ছড়া	(ক)	পুকুরঘাটে (দুটি ছড়া)	অচিন্ত্য সুরাল	সংগৃহীত	৮১
১১		(খ)	বুড়ির কারবার	সংহিতা	অমৃতা	৮২
		(গ)	চাঁদ নামচা	জামাল ভড়	সংগৃহীত	৮৩
		(ঘ)	গল্প নয়কো অল্প	হীরক সেন	সংগৃহীত	৮৪
		(ঙ)	দাড়ি	অমিতাভ প্রামাণিক	সংগৃহীত	৮৫
		(চ)	দূরদর্শী	জ্যোতির্ময় দালাল	সংগৃহীত	৮৬

১২	দেশ ও মানুষ	কবি আদিত্য মাণ্ডির গল্প		উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত	৮৭
১৩	ধাঁধা,মজা,রহস্য	(ক)	ধাঁধা	ইন্দ্রশেখর	মৌসুমী	৯১
		(খ)	কুইজ	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত	৯২
		(গ)	জানো কি	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত	৯২
		(ঘ)	ড্রুড্‌ল	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত	৯৩
		(ঙ)	কীসের ফটো	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি	৯৩
		(চ)	অবিশ্বাস্য	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত	৯৩
		(ছ)	মজার ইন্টারনেট	ইন্দ্রশেখর	সংগৃহীত	৯৪
		(জ)	হযবরল	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি	৯৫
		(ঝ)	গত সংখ্যার উত্তর	ইন্দ্রশেখর	দেবজ্যোতি	৯৫
১৪	ধারাবাহিক উপন্যাস	বগাচি জাতির সন্ধানে		শৌনক হালদার	মৌসুমী	৯৬
১৫	কাতুকুতু	পরজন্ম, ভুল সংশোধন, কীভাবে মরতে চাও, ফেসবুক		রসিকলাল সেন	সংগৃহীত	১০১
১৬	লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	(ক)	তিনটে ছড়া	অদিতি	সংগৃহীত	১০২
		(খ)	গ্যালারি	দেবোপমা, অন্তরা, মহুল, বাঘা		১০৩
১৭	পুরাণ কথা	শ্রীমযূরেশ কথা		সংহিতা	অমৃতা	১০৪
১৮	রাশিয়ান গল্প	সবুজ চোখের আলো		লোসিফ ডিক	সংগৃহীত	১১০
১৯	পুরাতনী	বৈষ্ণব চূড়ামণি		দাদাঠাকুর	সংগৃহীত	১১২
২০	সেই আয়না	সেই আয়না		সুজয় রায়	মৌসুমী	১১৪
২১	স্মরণীয় যাঁরা	ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার		ইমন চ্যাটার্জি	সংগৃহীত	১১৭
২২	খেলার রাজা পর্বতারোহণ	এভারেস্ট		এরিক শিপটন। অনুঃবাসব চট্টোপাধ্যায়	সংগৃহীত	১১৯
২৩	টাইম মেশিন	ঠগীর আত্মকথা		অলবিরুণী	মৌসুমী	১২৩
২৪	বই পড়া	নোলেদা		মহাশ্বেতা	সংগৃহীত	১৩১
২৫	লোককথা	লাই আর আম্বামের গল্প		মহাশ্বেতা	মৌসুমী	১৩২
২৬	ট্রেকিং	হিমালয়ের হিমবাহ পরিচিতি ও ট্রেকিং রুট		রাজকুমার রায়চৌধুরী	সংগৃহীত	১৪১
২৭	বিশ্বের জানালা	কম্বোডিয়া		উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত	১৪৭
২৮	সেই মেয়েরা	ক্লারা বার্টন		উমা ভট্টাচার্য	সংগৃহীত	১৫৫

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

তুলিতে, মাউসে, কি বোর্ডে, ক্যামেরায়

দীপংকর

ন্যাশনাল ইনসটিট্যুট অব ডিজাইন -এর ছাত্র

কবি-পাহাড়ু শান্তনু

হাজারো কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে তোমাদের জন্য কি বোর্ডে, মাউসে, তুলিতে কি ক্যামেরায়, লেখা কম্পোজ করে, ছবি গড়ে জয়ঢাককে সাজিয়ে তুলেছেন এই বন্ধুরা।

সরকারী কর্মী মৌসুমী

অধ্যাপক অমৃতা রায় (দাস)

মুকুট

বেসরকারী চাকুরে অনুপম

শিক্ষানবীশ সম্পাদক

ফটোগ্রাফার উমাদি

দেশ ও মানুষ, সেই মেয়েরা, বিশ্বের জানালা

ওয়েবকবি সংহিতা

ভারতের বৈজ্ঞানিক, ভারতের বনাঞ্চল, পুরাণ কথা

মহুল

পুরাতনী, স্মরণীয় যাঁরা

মহাশ্বেতা

লোককথা, বই পড়া

আমাদের কথা

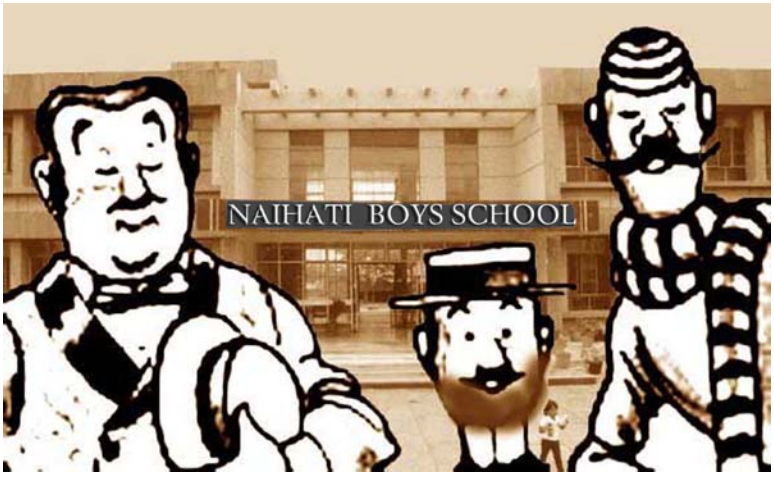

আজ থেকে অনেককাল আগে শুকতারা পত্রিকার শক্তিমান হিরো বাঁটুল দি গ্রেট মাঝে মাঝে হাঙরের রোস্ট দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে করতে একটা খবরের কাগজ পড়ত। তার নাম দৈনিক জয়ঢাক। একবার স্কুলপড়ুয়া তিন বন্ধু মিলে একটা পোস্টকার্ডে শুকতারা দফতরে এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছিলো যে দৈনিক জয়ঢাক পত্রিকার সদস্য হতে চায় তারা। 'পয়সা লাগিলে বাবা দিয়া দেবে।' ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে প্রায় ছ'টি মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবার পরও যখন তার কোনও জবাব পাওয়া গেল না, তখন কাগজওয়ালাদের ওপর রাগ করে তিনজন মিলে ঠিক করল, না পাঠালো তো বয়েই গেল। তারা নিজেরাই তৈরি করে নেবে জয়ঢাক কাগজ।

সেই ঘটনার পঁচিশ বছর পরে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই তিন বন্ধু কলেজ স্ট্রিট থেকে ছেপে বের করল জয়ঢাক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। তারপর থেকে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ইন্টারনেট সংস্করণ বের হতে শুরু করল ২০০৮-এর মার্চ থেকে।

কিছুকাল আগে জয়ঢাকের এক বন্ধু হঠাৎ এক বিচিত্র হিসেব নিয়ে এলেন দফতরে। তাতে দেখা যাচ্ছে এক ফুট চওড়া ও চল্লিশ ফুট উঁচু একটা গোটা গাছ দিয়ে যতটা কাগজ তৈরি হয় ততটা কাগজ লাগছে জয়ঢাকের একটা সংখ্যা ছেপে বের করতে। তিনি প্রশ্ন করলেন সাহিত্যসেবা করবার জন্য প্রতি তিন মাসে একটা করে স্বাস্থ্যবান , পুরোন গাছকে মারাটা কি জয়ঢাকিদের উচিৎ হচ্ছে? সেই শুনে ইস্তক এই মুহূর্তে শুধুমাত্র আন্তর্জাল সংস্করণেই বের হচ্ছে জয়ঢাক পত্রিকা। ছাপার বই বেরোন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

দুটো প্রধান উদদেশ্য নিয়ে কাজ করে এই পত্রিকা। নির্ভেজাল আনন্দ দেবার পাশাপাশি নিজের দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিশোর পাঠকদের গভীর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া, আর অন্যদিকে সারা দুনিয়ার নানা আকর্ষণীয় খবর তাদের কাছে এনে হাজির করা। যে শিক্ষা প্রথাগত স্কুলের সিলেবাসে মিলবে না অথচ বড় হয়ে ওঠবার পথে নিতান্তই প্রয়োজন,

আনন্দের পাশাপাশি সেই শিক্ষার স্বাদটিও স্কুলপড়ুয়াদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজটা সাধ্যমত করছে জয়ঢাক।

এ ছাড়াও ভবিষ্যতের সম্পাদক গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে নানা বয়সের সসম্পাদকের একটি দল তৈরি করা হয়েছে। সেখানে বড়ো আর মাঝারিদের সস্নেহ প্রশ্রয়ের ছায়ায় বেড়ে উঠবে আগামিদিনের নবপ্রজন্মের পত্রিকা সম্পাদকের দল, এই আমাদের আশা।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

সমপাদকমণ্ডলী: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য , বাসব চট্টোপাধ্যায় (অ: জা:), পার্থ চট্টোপাধ্যায় (পু:নি:)

সহ-সম্পাদকমণ্ডলীঃ মহুল, মহাশ্বেতা, উমা ও সংহিতা

অলংকরণ নির্দেশনা: মৌসুমী রায়

আন্তর্জাল নির্দেশনা: রোহন কুদ্দুস।

ডাকযোগাযোগ: জয়ঢাক, প্রযত্নে সুচেতনা প্রকাশন, ১৬এ টেমার লেন। কলিকাতা-৯

মেইল যোগাযোগঃ joydhak@gmail.com

জয়ঢাকি বোল

পৃথিবী এবং জলের কোলের আদরের মেয়ে আমি
আকাশের কোলে বাড়ি
সমুদ্র, নদী, কতো শত জলাশয়
পার হয়ে দিই পাড়ি
পৃথিবীর বুকে ঝরে ঝরে পড়ি হয়ে আকাশের স্নেহ
মরিনা তো তবু, বেঁচে রই ধরে নতুন নতুন দেহ।

এ হল মেঘের কথা। শেলি নামে একজন ইংরেজ কবির কলমে মেঘের জবানিতে লেখা একটা কবিতার অংশ এটা। পৃথিবীর সেই আদরের মেয়ে তার আকাশের বাড়ি ছেড়ে আরো একবার পুঞ্জমেঘ হয়ে ছুটে আসছে আমাদের দেশের দিকে। দিনরাত সে ঝরে পড়বে ফের তার পৃথিবী মায়ের বুকে। জলধারা হয়ে বয়ে যাবে পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে, তারপর ফের সূর্যের ছোঁয়া পেয়ে বাষ্প হয়ে ফিরে যাবে তার আকাশের বাড়িতে। যুগ যুগ ধরে এই খেলা চলেছে সূর্য , আকাশ জল আর পৃথিবী মিলে। যখন খুব বৃষ্টি নামবে তখন একবা পড়াশোনা, কম্পিউটার খেলা, কার্টুন সিরিয়াল ছেড়ে চুপটি করে জানালার ধারে বসো। হয়তো ঝরে পড়া বৃষ্টিধারার মধ্যে এই গানটা শুনতে পাবে। ভালো থেকো এই বর্ষায়।

ভালোবাসায়,
তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা।

সঙ্গের ছবিটা আকাশ থেকে কলকাতায় বর্ষার ছবি। মহাশ্বেতার ক্যামেরায়

বিল্লিগুলো

বিল্লিগুলো যখন তখন
দিনের বেলা রাতের বেলা
আলসে বেয়ে ঊর্ধ্বে চেয়ে
দেখিয়ে বেড়ায় ট্রাপিজ খেলা

বিল্লিগুলো যখন তখন
সন্ধে, আধা, গভীর রাতে
পাশের বাড়ির টিনের ছাতে
ওঁয়াও মিঁয়াও তানপুরাতে
বসিয়ে দেয় গানের মেলা

চারটে সাদা, পাঁচটা কালো
পাটকিলে রঙ সে-ও আছে
রান্নাঘরের বেজায় কাছে
সকাল বিকেল দিচ্ছে থানা
জানলা ঘেঁষা বকুল গাছে।

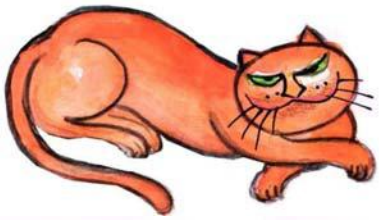

রংবেরঙের বেড়ালগুলো
পাঁচটা মেনি , পাঁচটা হুলো
দুষ্টু হলেও মিষ্টি ভীষণ
নরম যেন পশম, তুলো

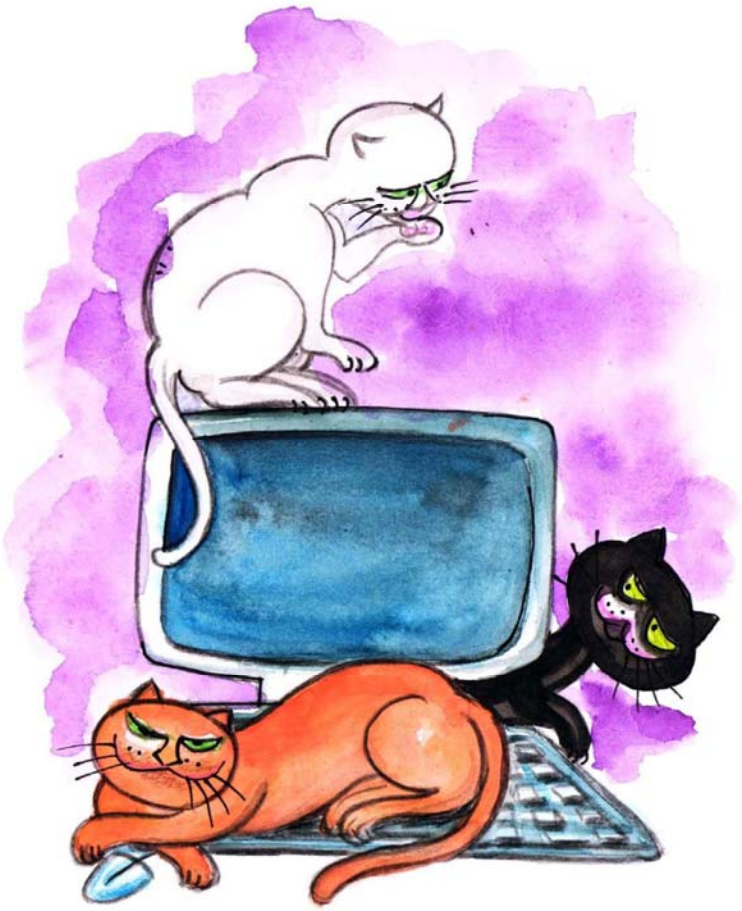

আমার ঘরের খাটবিছানায়
বইয়ের তাকে কম্পুটারে
যেদিকে চাই যখন তখন
সবুজ চোখের ঝিলিক মারে

আমিও এখন সামলে থাকি
খাটবিছানায় মাছের কাঁটা
পর্দাজোড়া ফর্দাফাটা
থাবায় ছাপা ফুলেল চাদর
মায়ের থেকে লুকিয়ে রাখি

লেখাঃ দেবজ্যোতি
ছবিঃ মৌসুমী

মামি ফিরে আসবেই

লেখা আর ছবিঃ মুকুট (ক্লাস-থ্রি)
যন্ত্রতুলিঃ ইন্দ্রশেখর

একটা লোক ঠিক করলো পিরামিডে ঢুকবে।

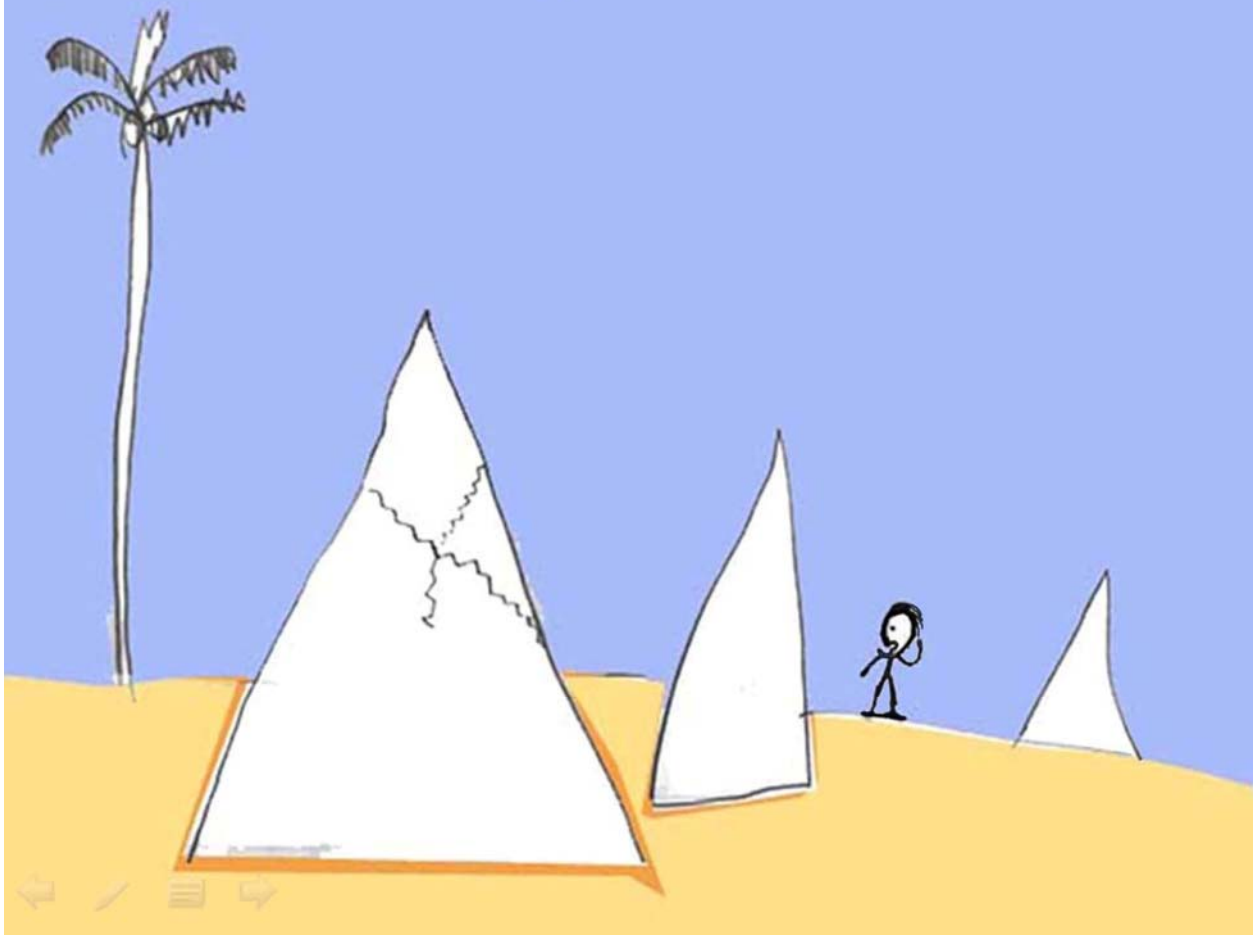

লোকটা ভীষণ জোরে পিরামিডের গায়ের পাথর টানলো।

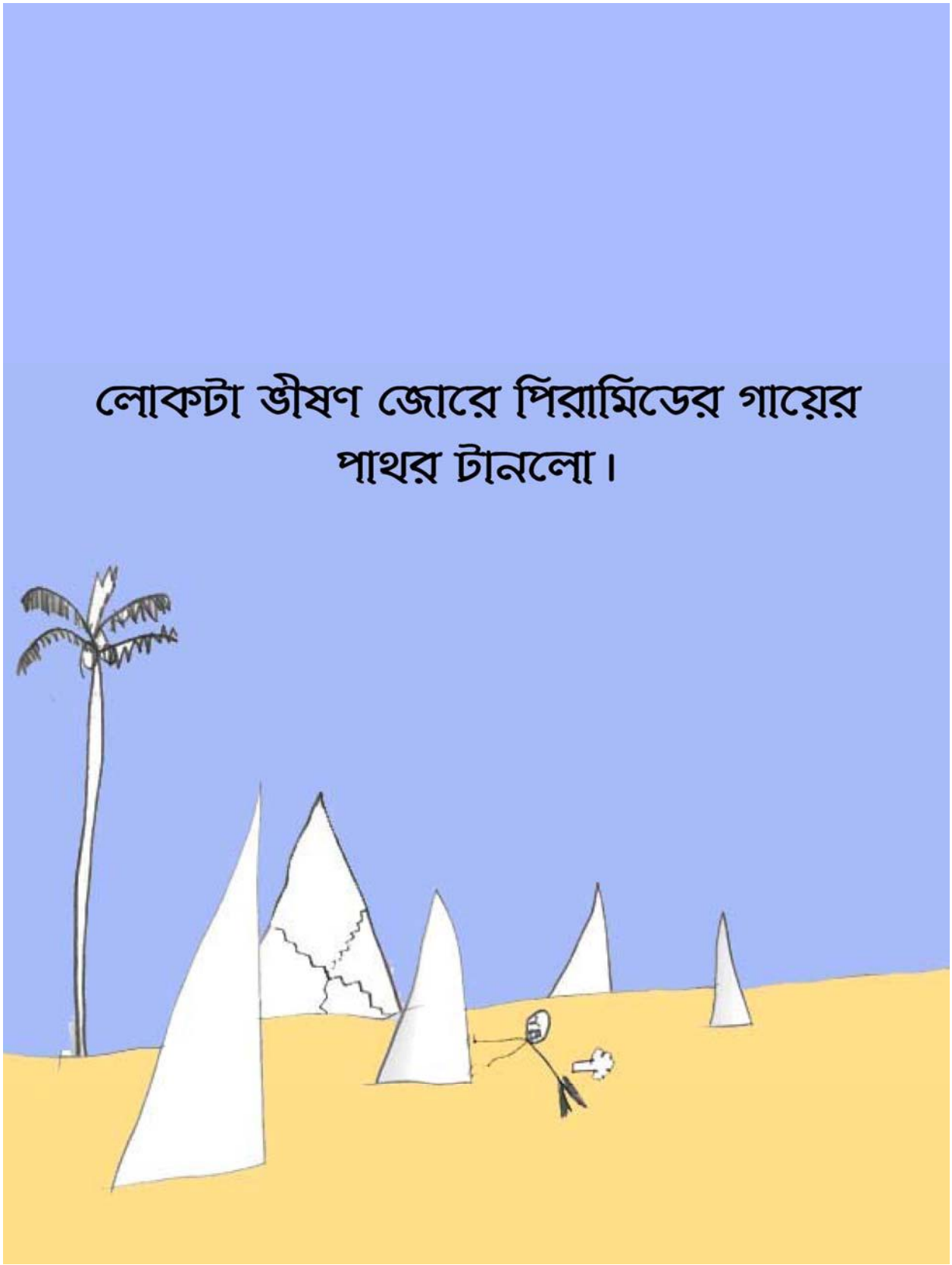

অতিকষ্টে অনেকক্ষণ টেনে টেনে
পাথরটা বের হল।

তারপর সে ঝাঁপ দিয়ে পিরামিডে ঢুকলো

পিরামিডের তলায় সুড়ঙ্গ দিয়ে
পিরামিডের নিচে
মাটির তলায় প্রাচীন
ছবি আর লেখা!!

ছবি দেখতে দেখতে ধাঁই করে গর্ত
দিয়ে নিচের ঘরে পড়ল
তার সিঁড়ি
বেয়ে
নিচে নেমে
দেখে একটা
মমি--

তারপর মমিকে মাথায় নিয়ে চলতে চলতে --

--সে বাইরে বেরিয়ে এল।

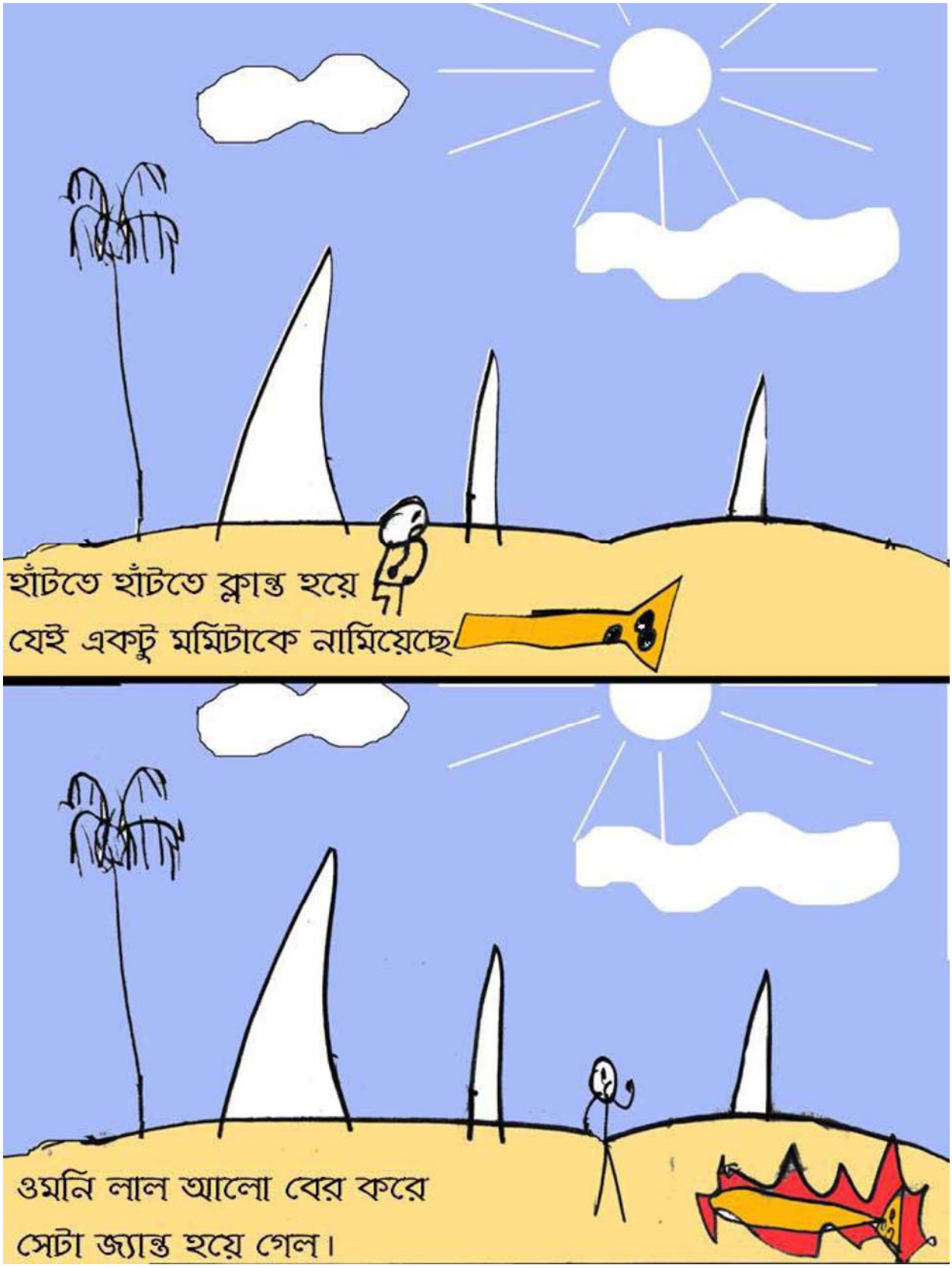
হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে
যেই একটু মমিটাকে নামিয়েছে
ওমনি লাল আলো বের করে
সেটা জ্যান্ত হয়ে গেল।

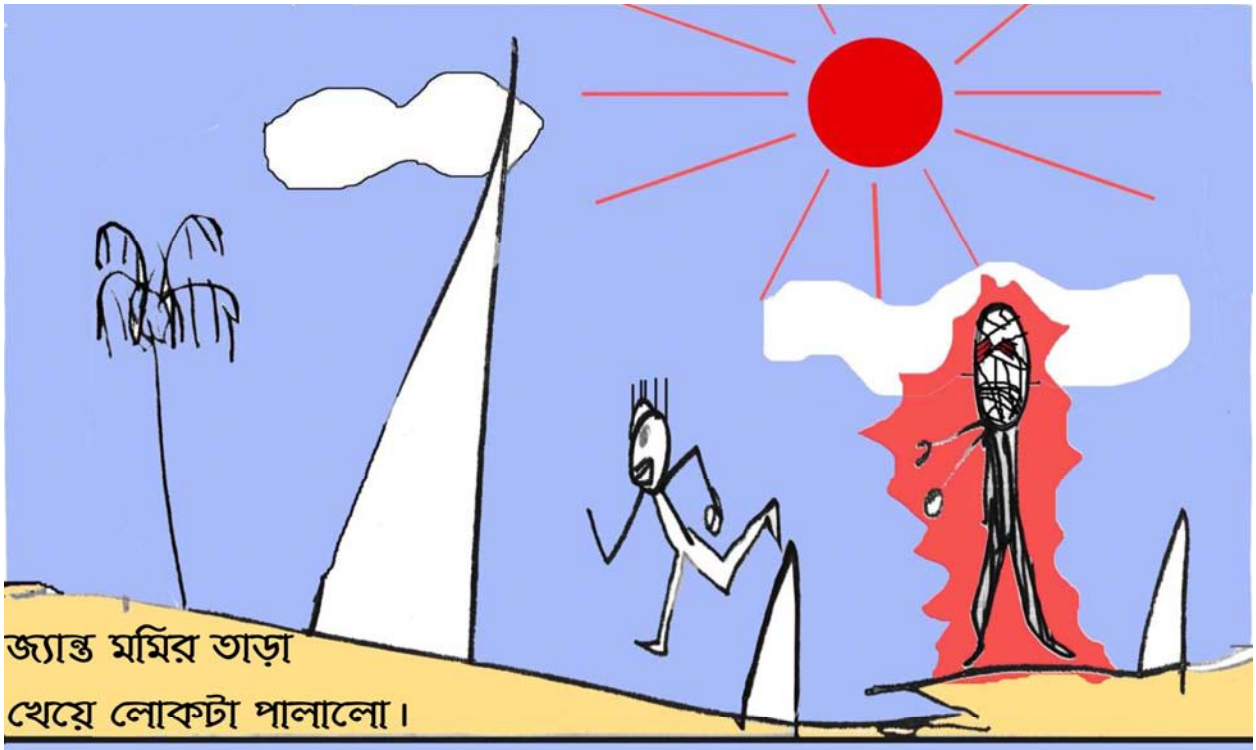
জ্যান্ত মমির তাড়া
খেয়ে লোকটা পালালো।

প্লেনে করে পালাতে গিয়ে দেখে মমি পেছনে বসে হাসছে।

তারপর মমি প্লেনটাকে
ধ্বংস করে লোকটাকে
তাড়া করল।
লোকটা শেষে অনেক
জোড়হাত করল। কিন্তু
মমি শুনলো না।

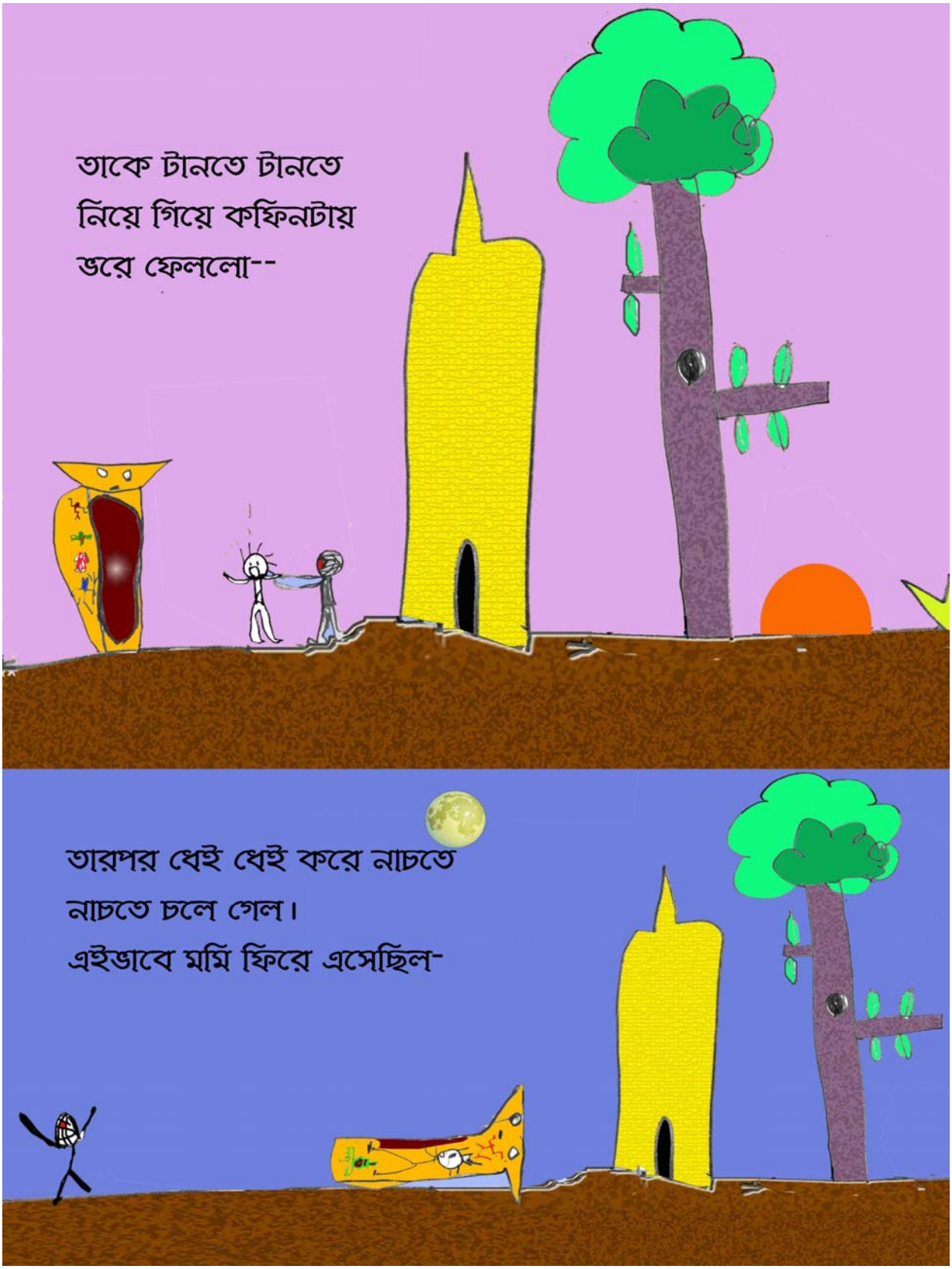
তাকে টানতে টানতে
নিয়ে গিয়ে কফিনটায়
ভরে ফেললো--
তারপর ধেই ধেই করে নাচতে
নাচতে চলে গেল।
এইভাবে মমি ফিরে এসেছিল-

গল্প

আক্রমের কথা

চিঙ্কুমারী সিং

আজ রথযাত্রা। দুপুরে ইস্কুল ছুটি হয়ে গেছে। আক্রম খুব খুশি। বিকেলটা আজ তাড়াতাড়ি শুরু হবে। অনেকক্ষণ খেলা যাবে। আর দুপুরে খাবার টাকা তিনটেও বেঁচে গেছে। সামনে ঘুড়ির সময় আসছে। টাকা থাকলে ভালোই হবে। মজিদের টোপ্পা গুলিটার মতো একটা গুলিও কেনা যেতে পারে। টাকা তিনটে কী করে কাজে লাগানো যায় ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফেরা, বই রাখা, খাওয়া হয়ে গেল। গুলির বটুয়াটা নিয়ে লাফ মেরে চৌকাঠ পেরিয়ে মুখোমুখি হয়ে গেল আব্বার।

সন্ধে হয়ে এল প্রায়। দুটো টিয়া বিক্রি হয়ে গেছে। আব্বা জিলিপির দোকানে ব্যস্ত। খুব ভিড় এখন। পাঁপড় আর জিলিপি কিনতে যতো লোক জড়ো হয়েছে, রথ বোধ হয় ততোগুলো লোক দেখে নি। নর্দমার পাশে বসে মশার কামড়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছে আক্রম। আব্বা যখন পাকড়ে চিড়িয়াদাদার আড়তে নিয়ে গিয়েছিল, তখন খুব রাগ হয়েছিল আক্রমের। কিন্তু মেলায় এসে দু কদম দূরে মজিদও খরগোশের ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে দেখে রাগ পড়ে গিয়েছিল। মজিদই বুদ্ধি দিয়েছে আক্রমকে পাখিগুলো চিড়িয়াদাদার সেলামির দুগুণায় বেচতে। তাতে আব্বা

কেড়ে নিলেও কিছু টাকা থাকবে আক্রমের কাছে। সেই টাকা দিয়ে আক্রম একটা ফানুস ঘুড়ি কিনবে; না হলে রেশমী মাঞ্জা; না একটা বোম্বাই লাটাই; না হলে — মশাটা ভাবনার ঘোর কাটিয়ে দিল। বিরক্ত আক্রম পা চুলকোতে চুলকোতে দেখল, খদ্দের এসেছে।

দরদাম না করেই খদ্দেরটা ঝপ করে খাঁচাটা তুলে নিল। তারপর আর চার-পাঁচটা লোক এসে বাকি খাঁচাগুলোও উঠিয়ে নিল। শেষে একটা লোক আক্রমকে বলল, "চল"। আক্রম থতমত খেয়ে বলল, "কোথায়? আমার পাখিগুলো দাম না দিয়ে ওঠালেন কেন?" লোকটা ফিক করে হেসে বলল, "যেতে যেতে বলছি, চল।" আক্রম প্রতিবাদে গর্জে উঠল, "না যাব না, আমার পাখি ফেরত দাও।" লোকটা বলল, "পাখি তো দেবই না। তোকেও যেতে হবে।" এবার আক্রম একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেল, প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "পাখির দাম দিলে না, পাখিও দিলে না, আব্বা আমায় মেরে ফেলবে-" । লোকটা আবার হেসে বলল, "আমার সঙ্গে গেলে আব্বা তোকে আজ ধরতেও পারবে না। কাল যখন তোকে আব্বা নিয়ে যাবে, তখনও মারতে পারবে না।"

আক্রম আবার রেগে গেল একটু, এবার আব্বার ওপর। নিজে কিচ্ছুটি দেখবে না; খালি পয়সা দে, পয়সা দে করে মারবে; এতোগুলো বড়ো বড়ো লোক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; আব্বা একবার এদিকে আসছেও না; একরাত হাওয়া হয়ে গেলে টের পাবে আব্বা যে সে নেই মানে পয়সাও নেই; ঠিক হবে। তারপর রাগ গিয়ে পড়ল মজিদের ওপর। মজিদটা এমন ভান করছে যেন আক্রমকে চেনে না। ঠিক হবে, তার খবর দিতে না পারলে চিড়িয়াদাদা আচ্ছা করে -।

আক্রম লোকটার সাথে একটা গাড়িতে উঠে পড়ল। এ গাড়িটা বাস নয়, একটা পুঁচকে ট্রাকের পেছনে পাতা লোহার বেঞ্চ, সেখানেই অনেকজন বসে। লোকটা টুক টুক করে চলন্ত গাড়িতেই জিজ্ঞেস করতে লাগল আক্রমকে যে ও কবে থেকে পাখি বেচে, পাখি ছাড়া আর কী বেচে, এই সব। আক্রম সবই বলে দিল একে একে। আব্বার কথা, মজিদের কথা, চিড়িয়াদাদার কথা।

তারপর ওরা একটা থানায় এল। সেখানে ওকে গাড়িতে বলা সব কথাই আবার বলতে হলো। ফের পাখিধরা লোকেরা ওকে একটা বাড়িতে পৌঁছে দিল। যাবার সময় সেই লোকটা ওকে বলে দিল পরদিন সকাল সকাল তৈরি থাকতে।

এই বাড়িটায় যে লোকটা কাগজপত্র মিলিয়ে আক্রমকে রাখল, সে লোকটা নবু নামে একটা ছেলেকে ডেকে আক্রমকে খেতে দিতে বলল। নবু ওকে আপিসঘর থেকে অনেকগুলো কাঠের টেবিলওয়ালা একটা ঘরে এনে খেতে দিল। তারপর গল্প ফাঁদার চেষ্টা করল। কিন্তু আক্রমের বড়ো বড়ো হাই উঠতে লাগল। তখন নবু ওকে একটা লম্বা ঘরে নিয়ে এল। অত লম্বা ঘর আক্রম আগে কখনও দেখে নি। ঘরটায় সার সার বিছানা পাতা। ছেলেরা ঘুমোচ্ছে। সে ঘরে আক্রমও ঘুমিয়ে পড়ল।

একটানা ঘন্টার শব্দে সকালে ঘুম ভেঙে গেল আক্রমের। জেগে উঠে গোসল সেরে তৈরি হয়ে নিল। তারপর আপিস ঘরে এসে বসে রইল। আপিসের ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় নটা

বাজতে পাখিধরা লোকেরা এল। কিসব কাগজপত্র লেনাদেনা করে আক্রমকে নিয়ে গেল গাড়িতে।

গাড়িতে আক্রমের পাখিগুলোও ছিল। পাখির সাথে আক্রমকে আবার ওরা একটা বাড়িতে নিয়ে এল। বাড়িটায় অনেক লোক। একটা ঘরে ঢুকল সবাই আক্রমকে আর ওর পাখিদের নিয়ে। ঘরটায় আব্বাও ছিল। আব্বাকে দেখে আক্রমের খুব কান্না পেল। আম্মির জন্য মন কেমন করছে। আব্বার ওপর রাগ হয়েছিল বলে আম্মির কথাও ভুলে গেছে ভেবে আক্রম খুব, খুব কষ্ট পেল। ঘরের মধ্যে কালো ঢলঢলে জামা পরে সবার থেকে একটু দূরে এক দিদি বসেছিলেন। আক্রমকে পাখিধরা লোকেরা কাঠের খাঁচায় তুলতে, দিদি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?" আম্মির জন্য মনখারাপে গলায় কান্নার একটা দলা জমে ছিল; সেটা গিলে নিয়ে আক্রম বলল ওর নাম। দিদি তখন জানতে চাইলেন, "তোমার বয়স কতো?" আক্রম বলল, "আম্মি বলে, 'আসছে অগ্‌ঘানে দশে পড়বে'।" তারপর কিছু একথা সেকথার পর আব্বাকে ডেকে নাম, বয়স সব আবার জিজ্ঞেস করার পর, দিদি বললেন আক্রম পরের তিনমাস প্রত্যেক জুম্মাবারে পাখির সেবা করবে চিড়িয়াঘরে। আক্রম আম্মির কাছে ফিরতে পেয়ে মহা খুশি হলো।

প্রথম দিন চিড়িয়াঘরে কাজ করে ফেরার পর আব্বা নিয়ে গিয়েছিল চিড়িয়াদাদার কাছে। দাদা চিড়িয়াঘরের সব কথা শুনে আক্রমকে বলল যে ও যদি দাদাকে সাত-আটটা কছুয়া এনে দেয়, তাহলে দাদা ওকে একটা ফানুস ঘুড়ি কিনে দেবে। আক্রম পরপর সাতদিন স্বপ্ন দেখল বই আর জামার থলিতে ভরে এমন করে কছুয়া আনবে।

পরের জুম্মাবারে চিড়িয়াঘরে গিয়ে আক্রম কাজ হয়ে গেলে খুব পড়াশোনা করল আব্বা নিতে আসা অবধি । তারপর বায়না করে বড়োবাবুর অনুমতি নিয়ে কছুয়াদের খাঁচায় ঢুকল। বিকাশদাকে আড়াল করে ছোট্টো একটা কছুয়া ভরে নিল প্যান্টের পকেটে। তারপর জামা

বদলাবার সময় কছুয়া চলে গেল থলিতে। ঘরে ফিরেই দৌড়ে গেল চিড়িয়াদাদার কাছে। দাদা কছুয়া পেয়ে খুব আদর করল।

পরের তিনটে জুম্মাবারে একই রকম চলল। পাঁচ নম্বর জুম্মাবারে আব্বা চিড়িয়াঘর থেকে আক্রমকে নেওয়ার জন্য যখন পৌঁছল, তখন বড়োবাবু একলা আক্রমকে ডাকলেন তাঁর পর্দাঘেরা ঘরে। আক্রমের বইপত্র দেখতে চাইলেন। একে একে সব বই বার করার পর থলি নেড়ে বড়োবাবু জানতে চাইলেন, "আর কী আছে?" আক্রম ঢোক গিলে বলল, "কিছু না তো।" তখন বড়োবাবু থলিটাকে মুখ থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কছুয়াটাকে কোণে ঠেসে ধরে বললেন, "দেখ দেখি এটা কিছু কিনা।" আক্রম প্যাঁচ খুলে থলি থেকে কছুয়াটা বার করে দিল। বড়োবাবু বিকাশদাকে ডেকে বললেন, "এটাকে শশা কুঁচো খাওয়া।" আক্রমকে বাড়ি যেতে বললেন, আর বললেন পরের সপ্তাহে যেন মনে করে আসে ও চিড়িয়াঘরে।

তারপরের জুম্মাবারে বড়োবাবু আক্রমকে একটা বাগানে নিয়ে গেলেন। আক্রম খাঁচা খুলে খুলে সেখানে উড়িয়ে দিল টিয়া, ময়না, কোঁচবক, কোকিল। সেসব টিভির ছবির মতো ধরে নিয়ে আক্রমকে দেখালেন বড়োবাবু।

পরের পাঁচটা জুম্মাবারে আক্রম চিনল টিয়ার থেকেও সুন্দর পাখি বসন্তবৌরি আর বেনেবউ। দানা খাওয়াল কোটরে প্যাঁচা, লক্ষ্মীপ্যাঁচা, হুতুম প্যাঁচাকে। খুব মজা পেল চিড়িয়াঘরের বুড়োলোকেরা হুতুম প্যাঁচা নাকি ভুতুম প্যাঁচা কোনটা ঠিক তাই নিয়ে ঝগড়া করছে দেখে। একটা

চিলকে আসতে দেখে ও দানা দিলেই টিঙ্কুদা হাসে; বলে, "ও খেতে আসে নি, আড্ডা দিতে এসেছে।" আক্রম দেখে যে সত্যি পাখিটা দানা না খেয়ে চিলঘরের চিলেদের কাছে গিয়ে বসল। চিলঘরের চিলেরাও যেন বাইরের চিলটার ভাষণ শুনতে বসে গেল।

তারপর ফুরিয়ে গেল চিড়িয়াঘরে যাওয়া। ঘুড়ির দিনও কেটে গেল, ফানুস ঘুড়ি ছাড়াই। শীতের এক সকালে আক্রমকে আবার খালপাড়ের চিড়িয়া বাজারে মুনিয়া আর টিয়া দিয়ে বসিয়ে দিয়ে গেল আব্বা। কিন্তু আক্রম একটাও পাখি বেচার চেষ্টা করল না। সব খদ্দেরকে দরে পোষাবে না বলে এড়িয়ে গেল। তারপর পাখিধরা লোকেরা যেই বাজারে এল, আক্রম খাঁচা খুলে একে একে উড়িয়ে দিল টিয়া, মুনিয়া। তারপর খুব দৌড়ে পালিয়ে গেল বাজার থেকে দূরে।

ছবি - অনুপম

বিশ্ববাবুর বিশ্ব

সৌম্যদীপ বিশ্বাস

(১)

প্রায় দু ঘন্টা হতে চলল বিশ্ববাবু তাঁর নোট-প্যাডটার দিকে চেয়ে রয়েছেন। একটা অঙ্ক অনেকদিন থেকেই মাথায় ঘুরছিল, সেটা সলভ করার জন্যই তাঁর অধ্যবসায়। অঙ্কটা নোটপ্যাডে টুকছেনও বটে, তবে করতে গেলে কেমন যেন খটকা লাগছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অঙ্কের প্রফেসর বিশ্বপতিবাবু থাকেন গোল-দিঘির পাড়ে। পাঁচ-ছয় বছর হল বিপত্নীক। ছেলে-পুলেও নেই। এতদিন একাই থাকতেন। তবে দু-তিনমাস হল একজন লোক স্ব-ইচ্ছায় তাঁর বাড়িতে চাকরগিরি করতে এসেছে। নাম বিশ্ব।

বোঝাই যাচ্ছে বিশ্ববাবুর অবস্থা। নিজেই বিশ্বপতি দত্ত, তার ওপরে চাকর বিশ্ব। একই বাড়িতে দুজন এক নামের ব্যাক্তি দেখে অনেকে আশ্চর্য হন। তবে এঁদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। কিন্তু তা এখন বলব না, ক্রমে প্রকাশ্য------।

“দাদাবাবু, আপনার চা,” বেশ জোরেই বলল বিশ্ব। তবু বিশ্ববাবুর ঘোর কাটল না। চশমাটা নেমে এসেছে নাকের ডগার দিকে। তবু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

ডেকে কাজ হবে না। প্রমাদ গুনল বিশ্ব। কাছে গিয়ে একবার নোটপ্যাডটার দিকে ঝুঁকে পড়ে উৎফুল্ল স্বরে বলে উঠল, “এটার উত্তর তো 2x2।”

বিশ্ববাবু হতচকিত হলে “2x2 ? তুই কী করে জানলি?”

বিশ্ব কিছু একটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল, “এমনিই মনে হল, তাই বললাম।”

বিশ্ববাবু বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এমন একটা উত্তর তার কাছ থেকে প্রত্যাশাই করেননি তিনি। আবার প্যাডের দিকে তাকালেন তিনি। সলভের জন্য একটা ছকও কেটেছিলেন। এবার সেটাকে কাজে লাগালেন— হ্যাঁ, বিশ্ব ঠিকই বলেছে, অঙ্কের উত্তর 2x2!

“মিলল তো। নেন, এবার চা খান আর বাজারে যান। রান্না করব কী ? কিছু নেই।”

“তুই যা। আমাকে আবার চান করে দুটো ভাত খেয়েই ইউনিভার্সিটি দৌড়তে হবে।”

"ঠিক আছে।"

বিশ্ব দৌড়ালো বাজারে আর বিশ্ববাবু গেলেন স্নান করতে। কিন্তু যা অকল্পনীয় তাই আজ বাস্তব। বাথরুম থেকে বেরিয়েই চমকে উঠলেন বিশ্ববাবু।

"একি! বিশ্ব তুই!"

"বাজার করা হয়ে গেল।"

"এরই মধ্যে? দৌড়ে গেলি নাকি?"

"ও বিষয় আপনি ছাড়ুন। এই নেন, দেখুন, এই এই এনেছি- বেগুন ৫০ টাকার, মুলো ৩৬, মাছ ১২২, টমেটো ২৮, মোট ২৩৬ টাকা আর ফেরত এই ১৪ টাকা।"

"বাঃ! তুই তো বেশ পাকা-পোক্ত হিসাব করিস!"

"কী যে বলেন বাবু। বেশি জিনিস হলেই গুলিয়ে যেত।"

কথাবার্তা শেষ হল। কিন্তু বিশ্ববাবুর বিস্ময় কাটল না—একজন চাকর হিসাব দিল। ঠিক কবিতার মত স্পিডে। ইস! একে যদি কেউ অঙ্ক শেখাত, কি ভাল ছাত্রই না হত!

।২।

"আজকের দিনটাই খারাপ।" টেবিলের উপর হাত দিয়ে একটা জোর আওয়াজ করে বলে উঠলেন মিঃ ঘোষ। পুরো নাম হিমাংশু ঘোষ। ইনিও একজন অঙ্কের প্রফেসর যিনি তর্কের খাতিরে প্রতিদিন বিশ্ববাবুর পাশে বসেন।

বিশ্ববাবু উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

"কী বলব বলেন, আমার ক্লাসের ছেলেমেয়েগুলোর মাথা একেবারে গোল। একটা জিনিস দশবার বোঝালেও বোঝে না।"

"শিক্ষকদেরও কিন্তু ধৈর্য রাখতে হয়।"

"ধৈর্যের কথা বলেনই যখন তখন বলি, বর্তমানের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে গেলে ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে যায়।"

"অসম্ভব!"

"অসম্ভব? একটাও নমুনা দেখাতে পারবেন আপনি?"

উত্তরদাতা হেসে বললেন, "আমার চাকরই তার নমুনা। অঙ্কের মাথা একজন ম্যাথামেটিশিয়নের মতো।"

"চাকর ম্যাথামেটিশিয়নের মতো অঙ্ক করে? তবে সে চাকরি না করে চাকরগিরি করছে কেন? অল বোগাস।"

"বাজি ধরবেন?"

"ধরব। কী নিয়ে?"

"কিছু নিয়ে নয়। কেবল যে জিতবে তার মাথা অপরের থেকে বেশি শার্প এটা মেনে নিতে হবে।"

"ওকে।"

"তবে চলুন আজকে আমার বাড়ি।"

"ঠিক আছে।"

বিশ্ববাবু দূরদ্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন, তিনি বাজিতে জিতবেন। কারণ আজ সকালে বিশ্ব কঠিন অঙ্কটার উত্তর বের করে যা খেল দেখিয়েছে তার পরেও বলে দিতে হয় না যে গণিতজ্ঞের সব বৈশিষ্ট্য ওর মধ্যে রয়েছে। এরপরেও বিশ্ববাবুর উচ্চাকাংখা কম নয়। ক্লাস করাতে করাতেই ভাবছেন, এমন একজন সেক্রেটারি যদি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পেয়ে যেতেন তবে হয়তো $E=mc^2$ এর চেয়েও বড়োসড়ো কিছু সূত্র আবিষ্কার করে ফেলতেন।

শীতকালের ছোটো বেলা। তখন বিশ্ববাবু হিমাংশুবাবুর সাথে গলির মুখে পৌঁছেছেন, তখনই চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। চারিদিকে ঘরে ফেরা পাখিগুলোর ডাক ভেসে আসছে।

পাড়ায় ছেলে-মেয়েদের হইচই শুনতে শুনতে অভয়বাবুর চায়ের দোকানের সামনে এসেছেন এমন সময় কে একজন পেছন থেকে তাঁকে ডাকলো,

"আপনার নামই কি বিশ্বপতি দত্ত?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।"

" কী দরকার? বলুন।"

"সবার সামনে তো বলা যাবে না। আপনার ফোন নম্বরটা যদি দেন।"

বিশ্ববাবু ভ্রু কুঁচকালেন। তাঁর সঙ্গে একজন অচেনা মানুষের কী ব্যাক্তিগত দরকার থাকতে পারে? তাও মনের জিজ্ঞাসাটাকে চাপা দিয়ে ফোন নম্বর দিলেন।

"ঠিক আছে। আসি তবে।"

লোকটা কেমন যেন রহস্যময়। ফোন নম্বরটা নিয়েই মোড়ের মাথায় অদৃশ্য হল। হিমাংশু বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটাকে চেনেন?"

"উঁহু,এই প্রথম দেখলাম।"

বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন দুজনে। সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল বিশ্ব। দুজনে ঢুকতেই সরে গেল। বিশ্ববাবু অভ্যর্থনা করলেন,"আসুন।"

বৈঠকখানায় ঢুকেই একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন হিমাংশুবাবু। বললেন, "বাঃ! বেশ গুছিয়ে রেখেছেন তো।"

"এসব ওই বিশ্বরই কাজ।"

"বিশ্ব কে?"

"ওই যার কথা বলছিলাম।"

"ও! ওই ম্যাথামেটিশিয়নের শক্তিধারী চাকরটা!"

"ওকে শুধু চাকর বলবেন না। ও একটা উজ্জ্বল প্রতিভা।"

হিমাংশুবাবু মুখ ভ্যাংচালেন। কতকটা অবজ্ঞার সুরেই বললেন "কই তাকে তো দেখলাম না!"

বিশ্ববাবু ডাক দিলেন, "বিশ্ব! ও বিশ্ব!"

পাশের ঘর থেকে পর্দা ফাঁক করে বেরিয়ে এল বিশ্ব। দৃষ্টি তার উজ্জ্বল। শরীরে আজ কেমন যেন পরিবর্তনের ছোঁয়া। বলল, "কী বাবু?"

হিমাংশুবাবুকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি আমার একজন কলিগ। তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চান। ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারবে তো?"

"আগে তো শুনি প্রশ্নগুলো? তারপরে দেখব।"

হিমাংশুবাবু কাঠের একটা চেয়ারে বসলেন। তারপরে বিশ্ব-র দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, " $(a+b)^2$-এর ফরমুলাটা বল তো !"

বিশ্ব খানিকক্ষণ নীরবে থাকল। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "পারব না।"

হিমাংশুবাবুর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি জিতছেন। বিশ্ববাবুর উপর অপমানের কালো ছায়া পড়ল।

হিমাংশুবাবু মুখ মটকে বললেন, "ছিঃ, এ তো দেখছি কিছুই জানে না! যে অঙ্কের ভিত্তিগুলো ভুলে যায় সে অঙ্ক পারে না।"

বিশ্ববাবু বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আপনি চা খাবেন?"

"না। বিশ্বপতিবাবু, আমার এখানে থাকার কোনো দরকার নেই। আর বাজির কথা মনে আছে তো, ওটায় আমিই জয়ী। আসি তবে।"

হিমাংশু ঘোষ গর্বোন্নত ভাব করে চলে গেলেন। শুধু সদর দরজা অবধি যে ছায়া পড়ে রইল, সেটা একটা অপমানের কালো ছায়া যা গ্রহণ করা খুবই কষ্টকর!

এরপরে ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত। বিশ্ববাবু বিশ্বর কাছে গিয়ে সজোরে একটা চড় কষালেন তার গালে।

বিশ্ব কিছু বলল না। একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। দরজার সামনে একাকি দাঁড়িয়ে থাকলেন বিশ্ববাবু। অপমানে তিনি আজ জর্জরিত।

বিশ্ব চলেছে রাস্তা দিয়ে। একলা, চুপচাপ। আজ তার নিজের বলে কেউ নেই। শুধু এ আকাশ তার। এ মাটি তার। মানুষ আজ তার কেউ নয়। কোথায় যাবে সে? জানে না। কেউ জানে না। বিশ্বও জানে না।

।৩।

পরের দিন সকালের কথা। বিশ্ববাবু নিজেই চা করেছেন আজ। তা বড়োই তেতো হয়েছে। জামা-কাপড় কাচতে গিয়ে হাত ব্যথা করছে। রান্না করতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছেন। এভাবে তিনি বিশ্বর অভাব বেশ বুঝতে পারছেন। কিন্তু কী করবেন? সে যে কোথায় চলে গেল কে জানে!

হঠাৎ পাশের ঘরে থাকা টেলিফোনটা বেজে উঠল। বিশ্ববাবু ভাবলেন বোধহয় হিমাংশুবাবুই ফোন করেছেন। তাই একটা মোক্ষম জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে পাশের ঘরে এলেন। তখন টেলিফোনটা অনবরত বেজে চলেছে। তিনি কাছে গিয়ে আস্তে করে রিসিভারটা তুললেন। কড়া গলায় বললেন, "হ্যালো।"

"হ্যালো, আপনিই কি বিশ্বপতি দত্ত?"

গলাটা খুব চেনা। তবু ভারিক্কি গলায় বললেন, "হ্যাঁ।"

"আপনি কি এখন বাড়িতে?"

"কেন বলুন তো?"

"না, মানে আপনার সঙ্গে একটু দরকার।"

বিশ্ববাবু ফোনটা কেটে দিলেন। তাঁর কথা বলবার মেজাজই নেই এখন।

এখন তিনি একটা আরাম-কেদারায় বসে শুধু চিন্তা করছেন, বিশ্ব ছাড়া তাঁর দিনগুলো কী করে চলবে?

এমন সময় ডোর বেলটা বেজে উঠল। হঠাৎ তার মনে হল বিশ্ব বোধহয় ফিরে এসেছে। তিনি প্রায় কৌতূহলের সঙ্গেই দরজা খুললেন। না! বিশ্ব নয়, কালকে দেখা হওয়া সেই অচেনা লোকটা।

"নমস্কার, আমার নাম মনোতোষ বাগচি।"

"নমস্কার! ভেতরে আসুন।"

চারদিকে চোখ বুলিয়ে কাঠের চেয়ারে বসে প্রশ্ন করলেন, "আপনার চাকর কোথায়?"

বিশ্ববাবুর চোখে সন্দেহ ফুটে উঠল, "আপনি কী করে জানলেন যে আমার চাকর আছে?"

"না, মানে ওকে মাঝে মাঝে বাজারে যেতে দেখি তো।"

"তা আপনিও কি ওর পরীক্ষা নিতে এসছেন?"

"না, মানে-----।"

"আপনি কে?"

"সত্যি কথা বলতে আমি একজন বৈজ্ঞানিক। নানারকম যন্ত্র তৈরি করি।"

"তা এখানে কী কাজ?"

"তাহলে তো আপনাকে প্রথম থেকেই বলতে হয়।"

"কী ব্যাপারে?"

“শুনুন তবে। আমি তখন অক্সফোর্ডে অধ্যাপনা করি। তার সঙ্গে গবেষণার কাজটাও চালিয়ে যাই। এমন সময় হুট করে মাথায় চাপল রোবট বানানোর কথা। রাতদিন সেই সম্পর্কিত বই-পত্র পড়তে লাগলাম। আমার মনে একটা থিয়োরি আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে লাগল।

“কিন্তু, শুধু থিয়োরিতে আর কী কাজ হবে, প্র্যাকটিকাল কাজও তো করতে হবে! তাই একটা রোবট বানানো শুরু করলাম। বানালামও। অবিকল মানুষের মত দেখতে। আমার সারা জীবনের সমস্ত পরিশ্রম ও জ্ঞান ওর মধ্যে ঢেলেছি। ভালো ভাবে কিছুদিন কাজও করল। কিন্তু কিছুদিন পরে ওর মধ্যে স্বয়ংক্রিয় শক্তি জেগে ওঠে। আমার কন্ট্রোল তখন আর মানতে চাইল না। তখন ওকে নিজের বাড়িতে অর্থাৎ কলকাতায় নিয়ে আসি। কিন্তু ওর আচরণে বোঝা যাচ্ছিল যে ওর জায়গাটা পছন্দ নয়। কিছুদিনের মধ্যে ও পালিয়ে যায়। তখন আমি খুব চিন্তায় পড়ি। ও নিজেকে নিয়ে ভাবতে পারত। সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারত কিন্তু অপরের কাছে নিজের জ্ঞান ফলাত না। ওদিকে আবার আত্মমর্যাদাজ্ঞানও খুব বেশি। তাই একা একা কোথায় কী কীর্তি বাঁধিয়ে বসবে তাই নিয়ে ভয় হল। পুলিশ খোঁজ-খবর নিতে শুরু করল। কিন্তু কোন ফল হল না। তারপর সেদিন ওকে আপনার বাড়ি থেকে বের হতে দেখে আমার এখানে আসা। বিশ্ব-কে দেখেই চিনেছিলাম। ওকে আমি নিয়ে যাব।”

“মানে? আপনি কী বলতে চান?”

“মানে--, হ্যাঁ, ও আসলে একটা উন্নতমানের রোবট।”

ছবিঃ সংগৃহীত

গল্প

মাধুর কথা

তাপসকিরণ রায়

ছোট্ট মেয়ে মাধু। মাধু তার ডাক নাম, ভালো নাম মাধুরিমা। ক্লাশ ওয়ানের ছাত্রী। মাত্র পাঁচ বছরের মেয়ে। নিয়মিত স্কুলে যেতে হয় তাকে। ঘরে বসে বেশ সময় নিয়ে পড়ালেখা করতে হয়। তাতে তার কিছুই আসে যায় না! সে তো সব পারে, পড়া লেখা করতে তার ভাল লাগে। কোথাও কখনো আটকে গেলে মাকে কিংবা বাবাকে ধরতে হয়! তাঁরা বুঝিয়ে দিলে ব্যস, পড়া, লেখা, হোমওয়ার্ক কমপ্লিট! আর পায় কে তাকে? তারপর খেলা। একা একা? তা কেন, পাশের বাড়ির রাণু, কুন্তি, স্বরূপ সবাই আছে। কেউ না কেউ তো তার সাথী হয়ে ঘরে এসেই যায়!

তবে গ্রীষ্মের বা পুজোর ছুটি এলে কিন্তু অন্য রকম। মধুরিমার মনে হয় ঘুরে আসি কোথাও। বেড়িয়ে আসার জন্যে মন বড় ছটফট করতে থাকে। বড় মাসির মেয়ে মানু। ওর সঙ্গে মাধুর খুব ভাব। একই বয়সী ওরা। একই ক্লাসে পড়ে। গত বছর মানু ওরা মধুদের বাড়ি ঘুরতে এসেছিল। এবার বাবা বলেছেন, মাধুরা ঘুরতে যাবে। ভাবতে ভাবতে মাধু বলে উঠলো, কী মজা! কী মজা।

মা রান্নাঘর থেকে শুনতে পেয়ে বলে উঠলেন, "কিরে মাধু, কীসের মজা রে? একা একা কী মজা, কী মজা, বলে যাচ্ছিস!"

মার কথা শুনে একটু লজ্জা পেল মাধু, পরক্ষণেই হাসতে হাসতে বলে উঠলো, "মা, এবার আমরা মানুদের বাড়ি যাবো, তাই না?"

মা বললেন, "আচ্ছা সেই জন্যে কী মজা, কী মজা বলছিস!"

আবার হাসলো মাধু। মনে পড়ল বাবুলদার কথা। বড়মাসির বড় ছেলে। মানে মানুর দাদা। সেবার বাবুলদা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলো। রান্নাঘরে কুমড়োর বড়া ভাজছিলেন বড়মাসি। কুমড়ো ফুল বেসন দিয়ে মাখিয়ে তেলে ছেড়েছেন তিনি। অল্প আঁচে ভাজার জন্যে তিনি কুমড়ো ফুলগুলি কড়াইতে ছেড়ে অন্য কোনো ঘরে কাজে গেলেন। এদিকে বাবুলদা কোনো কাজে রান্নাঘরে ঢুকলো। চুরি করে রান্না ঘর থেকে এটা ওটা খাবার অভ্যাস আছে ওর। কুমড়ো ফুল ভাজা হচ্ছে দেখে ও লোভ আর সামলাতে পারলো না। খুন্তি দিয়ে কোনো মতে একটা ফুল ভাজা কড়াই থেকে নামিয়ে নিলো। এদিকে মা'র এসে পড়ার দিকটাও নজরে রাখছিল। দেখল মা অন্য ঘর থেকে কিছু বলতে বলতে এদিকেই আসছেন। বাবুল তাই দেখে তাড়াতাড়ি মুখে পুরলো গরম কুমড়ো ফুলের ভাজা। তারপর আর কি! উঁ, আঃ, বলে মুখ পুড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। এমনি সময় মা পৌঁছে গেলেন। চোর বাবুলদা ধরা পড়ে গেলো!

"এই তোরা দেখে যা," বড়মাসি চিৎকার করে বাচ্চাদের ডাকলেন। খেলনাবাটি ছেড়ে রান্না ঘরে হাজির হলো মাধু আর মানু।

"এই দেখ কুমড়ো ফুল ভাজা চোর," বাবলুদাকে দেখিয়ে বড়মাসি হাসতে হাসতে বলে উঠলেন।

"তুমি কুমড়ো ফুল ভাজা চোর?" হেসে বলে উঠলো মাধু।

"কে বললো, ধ্যাত," বলে বাবুলদা রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো। আজও মাধুর সে কথা মনে আছে। এ ঘটনার পর বাবুলদার সঙ্গে দেখা হলেই মাধু চোর, চোর, বলে খেপায়।

দেখতে দেখতে গ্রীষ্মের ছুটি এসে গেলো। মাধুর বড় মাসির বাড়ি কৃষ্ণনগর। ট্রেনে, বাসে যেতে সময় কম লাগে না। কলকাতা থেকে চার ঘন্টার ওপর তো লেগেই যায়। পুরো সাতদিন

মাসির বাড়ি কাটাবে ওরা। খুশি আর ধরে না ওর। আবার মানুর সঙ্গে দেখা হবে, আবার বাবুলদার সঙ্গে দেখা হবে। কত গল্প, কত কথা, কত খেলা হবে! মাধু আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলো।

দেখতে দেখতে ওরা পৌঁছে গেলো কৃষ্ণনগর। মাসির বাড়ি। রিকশা এসে থামল মাসির বাড়ির দোরের সামনে। মানু আর বাবুলদা যেন তৈরি ছিলো। ঘরের গেটের দরজা এক ঝটকায় খুলে গেলো। মানু, বাবুল রিকশার পাশে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো। মাসিও গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সবাইকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে।

মানু খুব খুশি। বলে উঠলো, "জানিস আমার বড় একটা ডল আছে! অনেক বড়। চল দেখবি। তুই ভয় পাস না যেন। ও কিন্তু চোখ পিট পিট করে!"

"চল, চল দেখা," বলে মাধু চলল মানুর বড় ডল দেখতে।

মানু খাটের নিচ থেকে বের করলো তার খেলার সমস্ত সরঞ্জাম। তার মধ্যে বড় ডলের বাক্সটাও আছে। ডলের বাক্সর ঢাকনা খুললো মানু।

"বাবাঃ, কত বড় ডল! আরে আরে, ওটা দেখি চোখ পিট পিট করছে," মাধু অবাক হয়ে বলে উঠলো।

"তোর কাছেও তো ডল আছে," মানু বলে ওঠে।

"ডল তো আছে, কিন্তু এত বড় না, আর চোখ তার একবার ওপরে নিচে হয়ে থেমে যায়। আর এটা তো তা নয়," বলে যায় মাধু।

সবকিছু ছেড়ে ওরা পুতুল খেলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনি খেলাধুলায় তিন-চার দিন কেটে গেলো। মানুদের পাশের বাড়িতে এক ক্রিশ্চান পরিবার ছিলো। মাধুর বড় মাসিদের সঙ্গে তাঁদের খুব ভাব। তাঁদের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তাঁরা নিমন্ত্রণ করে গেলেন। মাধুরা এসেছে জেনে ওদের সবাইকে ভালো ভাবে অনুরোধ করে গেলেন যাবার জন্যে। কোনও এক ক্রিশ্চান ইউনিটির গির্জার হলে উৎসব হবার কথা। রাতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। মাধুর বাবা একবার যাবেন না বলে ছিলেন। তারপর মাধুর বড় মাসি আর মায়ের ইচ্ছেতে না, বলতে পারলেন না।

মাধু, মানু বাবুলদা সঙ্গে বড়রা সবাই আছেন। নিমন্ত্রণ খেতে যাবার আনন্দ, তাও আবার সবাই মিলে--মানু, বাবুলদাদের সঙ্গে। মাধু, মানু সবাই খুব খুশি। মাধু তার বাবাকে বললো, "গির্জা তো আমি জানি, যে যিশু বলে লোকটাকে লোহা পুঁতে মারা হয়ে ছিলো--তার প্রার্থনাঘর হলো গির্জা, না বাবা?"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, যিশুখ্রিষ্ট। আমাদের যেমন ঠাকুর, ওদের খ্রিষ্টানদের ঠাকুর হলো, যিশু।"

"আচ্ছা বাবা, ওদের একজনই ঠাকুর নাকি? আমাদের তো কত ঠাকুর--লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা--" মাধু জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, মা, ওদের ঠাকুর দেবতা ভগবান বলতে ওই একজন," মাধুর বাবা বললেন।

"ও, ওদের তাহলে ঠাকুর নেই, কেবল ভগবান আছেন," ছোট্ট মাধু বলে ওঠে।

এমনি সময় বাবুল, মানু এসে বললো, "চলো, চলো, রিকশা এসে গেছে।" মাধু, মানু বাবুল নাচতে নাচতে রিকশার কাছে এসে হাজির হলো। তিনটে রিকশায় ওরা সবাই মিলে পৌঁছে গেলো।

গির্জা সংলগ্ন উৎসব হল। এখানে ক্রিশ্চান মেয়েটির বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে। রাতে রয়েছে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। সুন্দর লাইটিং, সুন্দর বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি গান চলছিল। মাধু বর-বৌকে দেখল। মনু, মাধু ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বৌ সাদা, সুন্দর পোশাকে সেজে বসে আছে। দেখতে কালো, কিন্তু মিষ্টি চেহারা। মাধুর দিকে তাকিয়ে নতুন বৌ হাসলো একবার। মাধুও হাসলো। নতুন বৌটিকে খুব ভালো লাগলো ওর। মাধু আর মানু এক জাগায় দেখল, হিন্দি গানের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা নাচানাচি করছিল। খুব আনন্দ হচ্ছিল ওদের।

মা, মাসিমা এক সময় ডেকে বললো, "মাধু, মানু তোমরা এসো, আমরা সবাই খাবো এখন।" বুফে সিস্টেমে খাওয়া চলছিল, টেবিলের ওপর সাজানো খাওয়া দাওয়ার সব জিনিস।

পাশে খালি প্লেট রাখা আছে। প্লেট নাও, যা পছন্দ করো ইচ্ছেমত নিয়ে নাও, যতটা পারো খাও। মানু আর মাধুর এমনিভাবে খাওয়া বেশ পছন্দ হলো। ওদের পছন্দমত খাবার নিয়ে খেতে লাগলো। এক সময় খাওয়া শেষ হলো। মাধু, মানু শেষবারের মত বর বৌকে দেখতে গেলো। নতুন বৌ মাধু, মানুকে দেখে হেসে উঠলো। বরকে সে কিছু বলছিল। নতুন বৌ হাত দিয়ে ইশারা করে ওদের কাছে ডাকলো। ওরা একটু সংকোচ নিয়ে বর-বৌয়ের দিকে এগিয়ে গেলো। ঠিক এমনি সময় মাধু দেখল দুটো লোক বন্দুক হাতে বর বৌদের পাশে এসে দাঁড়ালো। লোকগুলোর এই বড় বড় গোঁফ। দেখতে কালো আর মোটা। চিৎকার করে কী যেন বলে উঠলো ওরা। মাধু দেখল হঠাৎ উৎসবের সব আনন্দ থেমে গেলো। সবাই কেমন যেন ভয় পেয়ে চুপচাপ হয়ে গেলো!

উৎসব ঘরের দরজাগুলি ওরা ধুপধাপ করে বন্ধ করে দিলো। ওদের একজন চিৎকার করে বলে উঠলো, "চুপচাপ লাইন দিয়ে এই দরজা দিয়ে সবাই আসুন। যার কাছে যা যা টাকা পয়সা গয়নাগাঁটি আছে খুলে বের করে দিন। তা না হলে আমরা ছাড়ব না, অকালে আপনাদের প্রাণ যাবে!"

বাবুলদা পাশ থেকে ফিস ফিস করে বলে উঠলো, "ওরে বাবা, ডাকাত, ওরা ডাকাত!"

ডাকাতদের দলে আরও তিনজন লোক ছিল। বন্দুক, পিস্তল, চাকু নিয়ে ওরা উৎসব ঘর ঘিরে ফেলেছে। নতুন বর-বৌয়ের সমস্ত গয়না ওরা এসেই হস্তগত করেছে। এবার বাকি লোকেদের পালা।

সবাই লাইন দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সাথে তাদের নিজেদের হাতের, কানের, গলার গয়না, পকেটের টাকা-পয়সা বের করে ডাকাতদের ঝোলায় তুলে দিচ্ছে। এক জনের হাতে সোনার বালা থেকে গিয়ে ছিলো। ডাকাতদের একজন তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে চিৎকার করল, "খোল এগুলো।" আর একটা লোককে ওরা খুব মারলো। লোকটার পকেটে টাকা ছিলো। টাকাগুলি ডাকাতদের না দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

চারদিক চুপচাপ। মাঝেমধ্যে কারো কারো চাপা কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। জোরে কথা বলতে গেলেই ধমক দিচ্ছিল ডাকাতরা।

মাধু, মানু ওরা তেমন ভয় পেল না। কারণ ওদের কাছে তো কিছু নেই! তা হলে ওদের কীসের ভয়! মানু মধুকে বললো, "তোর কানে তো দেখছি দুল আছে, ডাকাতদের খুলে দিয়ে দিবি?"

মাধু হাসে, বলে, "হ্যাঁ, ডাকু আঙ্কেলকে দিয়ে দেবো।"

মাধু, মানু, বাবুল, ওদের মা বাবা লাইন ধরে এগোচ্ছিল। মাধু দেখল, সবাই নিজেদের হার, চুড়ি, আংটি, টাকা পয়সা হাতে নিয়ে রেখেছে। ডাকাতদের ঝোলাতে ফেলছে আর সামনের দরজা পার করে গির্জার ভিতরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ডাকুরা কাউকে এখনো ঘরে যেতে দিচ্ছে না।

মানু তবু ভয় পাচ্ছে। মাধুর মধ্যে তেমন ভয়ডর আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওরা লাইনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস গল্প করে চলেছে।

মাধুর মা, মাধুর কানের রিং খুলে নিলো। মাধু বলে উঠলো, "ওগুলো আমার হাতে দাও মা। আমি ডাকু আঙ্কেলের হাতে দেবো।"

আশপাশের আতঙ্কিত সবাই একবার মাধুর দিকে তাকিয়ে দেখল। এমন কি ডাকাত দলের একজন মাধুর কথা শুনে ওর দিকে খানিক তাকিয়ে নিলো। মাধু ওকে দেখে নিঃশব্দে সামান্য হাসলো।

মানু, ওর মা, বাবা, দাদার সঙ্গে আগে আগে বেরিয়ে গেলো। এবার মাধুর মা তাঁর গয়নাগাঁটি ডাকাতদের ঝোলায় ফেললো। আর মাধুর দিকে হাত বাড়ালো।

মাধুর হাতে রাখা তার কানের রিংগুলি। পাতলা সরু সরু দুটো রিং। সে ডাকাত আঙ্কেলের কাছে গিয়ে নির্ভয়ে বলে উঠলো, "ডাকাত আঙ্কেল, আমার এই কানের দুল দুটো নাও।"

ডাকু বললো, "এই ঝোলায় ফেলে দাও।"

মাধু বললো "না, অত উঁচুতে পারব না, তুমি হাত পাতো।"

ছোট বাচ্ছার নির্ভয় টকাস টকাস কথা শুনতে ডাকাতদের যেন খারাপ লাগছিল না। মজা পাচ্ছিল ওরা। মাধুর দিকে ওরা তাকিয়ে থাকলো।

মাধু তার কানের রিং দুটো একজন ডাকাতের হাতে তুলে দিয়ে বলে উঠলো, "দেখো আমার সব কিছু কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম! একটা কথা আমার শোনো!"

এদিকে ভয়ে মাধুর মা যাবার জন্যে মাধুর হাত টানলো। মাধু তবু তার কথা শেষ না করে যাবে না। ডাকাতের একজন বলে উঠলো, "কি খুকুমনি, কী বলছিলে তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।"

"বলছি আমার সব কিছু তোমাদের দিয়ে দিলাম। তোমরা কিন্তু কাউকে মারবে না, বুঝলে?" মাধু পাকা বুড়ির মত কথাগুলি বলে উঠলো।

এত উত্তেজনা ভয়ের মধ্যেও ডাকাতরা হেসে উঠলো। তাদের মধ্যে একজন মাথা নেড়ে বললো, "ঠিক আছে মামন, আমরা আর কাউকে মারব না।"

উৎসব ঘরের সবাই মাধুর সাহস দেখল। ওর সরলতা দেখল। সবার প্রতি তার সহানুভূতির ভাব দেখে অবাক হলো। গির্জায় বন্দি সবাই চাপা মুখে "সাবাস, সাবাস" বলতে লাগলো।

ডাকাতরাও সত্যি কাউকে মেরে ফেলা তো দূরের কথা কারো গায়ে আর হাত পর্যন্ত তুলল না!

ঘটনা রটে গেলো সমস্ত কৃষ্ণনগর শহরে। মাধুর কথা মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। মাধু হয়ে গেলো সাহসী বীরাঙ্গনা। ওই রাতেই প্রেস রিপোর্টাররা এলো। মাধুর ফটো তুলল। তার কাছে ডাকাতের গল্প শুনলো। পরদিন পত্রিকায় মাধুর ফটো এল। সবাই তার প্রশংসা করতে লাগলো।

ছবিঃ অনুপম

অমিত দেবনাথ

“পিসিমা এক্ষুণি নিচে নামবেন, মিঃ নাটেল, ততক্ষণ আসুন আমরা একটু গল্পটল্প করি।” বলল বছর পনের বয়সী মেয়েটি।

ফ্র্যামটন নাটেল একটু ইতস্তত করল। এখানকার কাউকেই সে চেনে না। আর চিনবেই বা কী করে, একেবারে গ্রাম্য জায়গা। এমনকি যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে, তাঁকেও সে চেনে না। একমাত্র ভরসা তার বোন যে চিঠিটা লিখে দিয়েছিল, সেটা। বোন বলেছিল যে সে এখানকার যাকে যাকে চেনে, সবাইকেই চিঠি লিখে দিচ্ছে। “সবার সঙ্গে দেখা করবি আর মিশবি, না হলে তোর অবস্থা আরো খারাপ হবে।”

তো যাই হোক, খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে থাকার পর মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, “এখানকার কাউকে চেনেন-টেনেন?”

"না না," বলল ফ্র্যামটন, "আমার বোন এখানে একবার এসেছিল বছর চারেক আগে। তো তখন ওর সঙ্গে যাদের যাদের আলাপ হয়েছিল তাদের সবার নামেই ও চিঠি করে দিয়েছে দেখা করার জন্য। তাদের মধ্যে তোমার পিসিমার নামেও চিঠি আছে। তাই আমি - ।"

"ও;, তা হলে আপনি পিসিমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না?" বলল মেয়েটা।

"জানি মানে শুধু নাম আর ঠিকানাটা।"

"হ্যাঁ, সেই দুঃখজনক ঘটনা — মানে ট্র্যাজেডিটা তো ঘটেছিল তিন বছর আগে।" ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটা। "আপনার বোন যাওয়ার পরে।"

"ট্র্যাজেডি?" অবাক হলো ফ্র্যামটন। এরকম একটা পরিপূর্ণ শান্তির জায়গায় দুর্ঘটনা আবার কী ঘটবে!

"আপনি হয়তো অবাক হচ্ছেন এই খোলা জানলাটা দেখে। বছরের এই সময়টায়, মানে —অক্টোবরের বিকেলে জানলা খোলা থাকাটা একটু আশ্চর্যের।" বলল মেয়েটা একটা খোলা বড়ো জানলা দেখিয়ে, যেটা দিয়ে সোজা লনে যাওয়া যায়।

"এ বছরটায় অবশ্য এখনও বেশ গরমই আছে," বলল ফ্র্যামটন, "কিন্তু এই জানলাটার সঙ্গে — ইয়ে — ঐ ট্র্যাজেডির কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?"

"এই জানলা দিয়েই তিন বছর আগে আমার পিসেমশাই আর আমার দুই কাকা শিকার করতে গিয়েছিল। কিন্তু জলা পেরোতে গিয়ে ওরা পাঁকে ডুবে যায়। ওদের কাউকেই আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।" গলাটা একটু ধরে এলো মেয়েটার। "সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার কী জানেন, পিসিমা এখনও ধরে বসে আছে ওরা ফিরবে, যে কোনো দিন ফিরে আসবে।ওদের সঙ্গে যে ছোট্ট বাদামি স্প্যানিয়েল কুকুরটা ছিল, যেটা ওদের সঙ্গে ডুবে গেছিল, সেটাও ফিরে আসবে। ফিরে আসবে এই জানলা দিয়েই। তাই পিসিমা প্রত্যেকদিনই এই জানলাটা খুলে রেখে দেয় অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত। পিসিমা প্রায়ই আমাকে গল্প করে ওরা কীভাবে গেছিল, পিসেমশাইয়ের হাতে কীভাবে ঝোলানো ছিল সাদা ওয়াটারপ্রুফটা। পিসিমার ছোটো ভাইটা, ছোটো কাকা, কী রকম হেঁড়ে গলায় গান গাইছিল সব। জানেন, আমি শুনি আর মাঝে মাঝে নিজেই কেঁপে উঠি। যদি সত্যি কোনোদিন দেখি এই জানলা দিয়ে ওরা ঢুকছে!" বলতে বলতে কেমন শিউরে উঠলো মেয়েটা। ফ্র্যামটন ঘাবড়ে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাবে এমন সময় ঘরে ঢুকলেন সেই ভদ্রমহিলা। "ভেরা মজা করছিল নিশ্চয়ই?" বললেন তিনি।

"চমৎকার মেয়ে।" বলল ফ্র্যামটন।

“আমার একটু দেরি হয়ে গেল নামতে, খুবই দুঃখিত, ক্ষমা করবেন। আর জানলাটা খোলা আছে বলে কিছু মনে করছেন না তো? আসলে আমার স্বামী আর ভাইয়েরা শিকার করতে গেছে

তো, ওরা এক্ষুণি ফিরবে। ওরা এখান দিয়েই ঘরে ঢোকে। ওরা এখান দিয়েই ঢুকবে আর কার্পেটটা কাদায় মাখামাখি করবে। ছেলেদের যা স্বভাব, বোঝেনই তো।” তারপর তিনি একনাগাড়ে বলে যেতে লাগলেন শীতকালে শিকারে গেলে কি রকম হাঁস পাওয়া যায়। ফ্র্যামটন ভাবছিল কী করে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যায়, কিন্তু একই সঙ্গে সে খেয়াল করল ভদ্রমহলা মোটেই তার দিকে দেখছেন না, বরং তিনি থেকে থেকেই তাকাচ্ছেন খোলা জানলাটার দিকে।

“আসলে ডাক্তারের নির্দেশ আমার কমপ্লিট রেস্ট দরকার, আর যে কোনো রকম মানসিক উত্তেজনা থেকে দূরে থাকতে হবে।” অবশেষে বলতে পারল ফ্র্যামটন, ভদ্রমহিলার কথার তোড় একটু থামলে। সে কী করে বোঝাবে যে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির কাছে, যারা কোনোদিনই ফিরবে না, তাদের শেষ যাত্রার পুংখানুপুংখ বিবরণ কতোটা অপ্রাসঙ্গিক।

“তাই নাকি?” আলগা ভাবে বললেন মিসেস স্যাপলটন। হাই তোলা চাপতে যেরকম আওয়াজ হয় অনেকটা সেরকম শোনাল সেটা। তারপর আচমকাই তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেটা অবশ্য ফ্র্যামটনের কথায় নয়।

“ওরা ফিরেছে, অবশেষে!” তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, “একেবারে ঠিক সময়ে! যাই চা করে আনি।”

ফ্র্যামটন সামান্য কেঁপে উঠলেও সামলে নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল সহানুভূতির দৃষ্টিতে। মেয়েটা তাকিয়ে আছে খোলা জানলার দিকেই। দুচোখে আতঙ্ক। ফ্র্যামটন ঘুরে তাকাল সেই দিকেই যেদিকে মেয়েটা দেখছিল।

বাইরের পড়ন্ত বিকেলের আবছায়াতে তিনটে মূর্তি নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে এদিকেই। তাদের পায়ের কাছে একটা ছোট্টো বাদামি স্প্যানিয়েল। সবার হাতে

বন্দুক। একজনের কাঁধে একটা সাদা কোট। তারপর তাদের মধ্যে কে যেন হেঁড়ে গলায় একটা গান ধরল।

ফ্র্যামটন তার হাঁটার ছড়িটা বাগিয়ে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে শোনা গেল হলঘর আর বাইরে বেরোনোর রাস্তার নুড়ি পাথরের ওপর তার ছুটে পালানোর শব্দ।

“আমরা এসে গেছি।” জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে ঘোষণা করলেন সেই ভদ্রলোক। যাঁর কাঁধে ঝোলানো ছিল কোটটা। “কিন্তু আমরা ঢুকতেই কে একটা দৌড়ে পালাল মনে হলো। লোকটা কে?”

“কে একজন মিঃ নাটেল।” বললেন মিসেস স্যাপলটন, “অদ্ভূত লোক। সারাক্ষণ নিজের অসুখ নিয়ে কথা বলছিল, কিন্তু তোমাদের ঢুকতে দেখেই এমন দৌড় লাগাল, যেন ভূত দেখেছে! একবার বলে পর্যন্ত গেলনা।”

“আমার মনে হয় কুকুর দেখে ভয় পেয়েছে।” মেয়েটা বলল। “লোকটা বলছিল বটে ওর কুকুরে খুব ভয়। একবার নাকি ওকে একপাল কুকুর তাড়া করে গঙ্গার ধারের এক গোরস্থানে নিয়ে যায়। সেখানে একটা নতুন খোঁড়া কবরে ঢুকে লোকটাকে সারারাত কাটাতে হয়েছিল, ওপরে ঘিরে রেখেছিল কুকুরগুলো। কুকুর দেখলে ঘাবড়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক।”

খুব অল্প সময়ের মধ্যে গল্প বানাতে পারাটা মেয়েটার একটা বিশেষ গুণ।

[সাকি (এইচ এইচ মুনরো) রচিত “দি ওপেন উইন্ডো” অবলম্বনে।]

ছবিঃ দীপংকর/সংগৃহীত

সৌরভ রায়

গরমের ছুটিতে প্রতিবারের মত এবারও আমরা দাদুর কাছে বেড়াতে এসেছি শিলিগুড়িতে। আমরা বলতে বাবা, মা, ভাই আর কাকুর পরিবার । আমাদের দাদু খুব ইন্টারেস্টিং মানুষ। বহু জায়গায় ঘুরেছেন দেশে বিদেশে । প্রথমে ডিফেন্স এবং পরে গুপ্তচর বিভাগে বহুবছর কাজ করেছেন — ফলত গল্পের কোনো অভাব নেই । রিটায়ার করে শিলিগুড়িতে ছোট্ট একটা ফার্মহাউস মতো করে থাকেন । ভারি মনোরম একটা বাংলো আর সাথে বাগান । রোজ বিকালে নাতি-নাতনীদের নিয়ে দাদু পাশের নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির বিরাট ক্যাম্পাসের চা বাগানে হাঁটতে যান, আর সেই সময় কত গল্প হয় কি বলবো ! আজও একটা নতুন গল্প শুরু হল । দাদুর জবানিতেই বলি ।

বেশ অনেকদিন আগের কথা । তখন আমি মুম্বাইতে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের মাঝারি মাপের অফিসার । অফিসের জুরিসডিকশনটা প্রায় পুরো উত্তর মহারাষ্ট্রে হওয়ায় প্রায় নানা কাজে এদিক ওদিক যেতে হতো । ভালোই লাগতো বুঝলি! ভারি সুন্দর জায়গাগুলো। মুম্বই থেকে বেরোলেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। সবুজের সমারোহ চতুর্দিকে। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। রাস্তাগুলো এঁকে-বেঁকে চলে গেছে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। দুদিকে জঙ্গল , পাহাড়ি ঝর্ণা – মনে হয় যেন পুরোটাই একটা পিকনিক স্পট । আর রাস্তা যখন পাহাড় বেয়ে উঠেছে তখন উপর থেকে দূর-দূরান্ত দেখা যায়। ছোটোবড় সবুজ পাহাড় গুলো দিগন্তে গিয়ে মিশেছে । কিছু কিছু পাহাড়ের উপর আছে শিবাজির আমলের দুর্গ । বেশ একটা রহস্যময় পরিবেশ এই অপূর্ব প্রকৃতির মধ্যে।

একবার অফিসেই একটি মারাঠি ছেলের সাথে আলাপ হলো। কি যেন কাজে এসেছিলো তা আজ আর মনে নেই । অল্পবয়েসি । প্রায় ৩০ মতন হবে । আমিও তখন ইয়ং ব্লাড, কাজেই বেশ দোস্তি হয়ে গেলো । কথায় কথায় সে বললো – তোমার ঘাট গুলো এত পছন্দ (মহারাষ্ট্রে এই পাহাড়ি অঞ্চলগুলোকে ঘাট বলে যেমন- মালসেজ ঘাট্ , খান্দালা ঘাট , কান্দা ঘাট এরকম অনেক ঘাট আছে), চলো তোমায় আমার গ্রামে নিয়ে যাই সামনের শনিবার। তোমার ভালো লাগবে । একরাত থেকে পরের দিন ফিরে আসবো। আমি তো সাথে সাথে রাজি । ব্যাচেলার মানুষ। সময় কাটানোই দায় অনেক সময়। শনিবার সকালে ওর জিপ নিয়ে বেরোলাম । কল্যাণ হয়ে চললাম আমরা নাসিকের দিকে। পথে মালসেজ ঘাট পড়লো । ভারি সুন্দর জায়গা । ঘাট থেকে নেমে জঙ্গলের পথে প্রায় আধ ঘন্টা চলে হাইওয়ে ছেড়ে আমরা বাঁদিকে কাঁচারাস্তায় ঢুকে পড়লাম । গাড়ির গতি কমাতে হলো কারণ রাস্তা কেবল নামেই। কখনো যে মেরামত হয়েছে মনে হয়না। হালকা জঙ্গল। জানা গেল হরিণ, নীল গাই ও লেপার্ড আছে । দুপুরের রৌদ্রালোক বিশাল গাছগুলির ফাঁক দিয়ে জঙ্গলে ঝরাপাতার উপরে পড়েছে । ভালোই লাগছিল গল্প করতে করতে পথ চলতে ।

প্রায় দেড় ঘন্টা অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে এসে পড়লাম সেই গ্রামে । কয়েকটি ছোট বড় কাঠের বাড়ি ,আর গ্রাম সংলগ্ন অল্প জায়গা জুড়ে ভুট্টা জোয়ারের খেত। চারদিকে পাহাড় আর পাহাড় – জঙ্গলে ভরা। দূরে একটা টিলায় একটা পুরানো কেল্লামতো।

ওর বাড়ির কাছে পৌঁছোতে প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ হলো বাড়ির ছাদটাতে । এরকম অদ্ভূত বাড়ি এর আগে দেখিনি কখনো – ঠিক ট্রি হাউস বলা যাবে না – আলাদাই বাড়ি কিন্তু এমন ভাবে জঙ্গলের সাথে তা মিশে গেছে যে যেন সেই অরণ্যদেবের খুলি গুহার মতো খানিকটা । চারিদিকে দেখলাম ছড়িয়ে থাকা গ্রামের অন্যান্য বাড়িগুলোও যেন একইরকম।

কাঠের দোতালা বাড়ি প্রত্যেকটি আর সামনেই উঠান। বাড়ির লোকজন বলতে বয়স্কা বাবা আর কয়েকজন আত্মীয় ।

খিদে পেয়েছিল দারুণ। বনমুরগি আর জোয়ারের রুটি খেলাম মহা তৃপ্তি সহকারে। অনেকটা রাস্তা এসেছি। খাওয়ার পর ঘুম এসে গেলো নিমেষে । বাইরে একটা খাটিয়াতে চাদর পেতে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো অনেক বাদে বন্ধুর হালকা ধাক্কায়। উঠে দেখি প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। তড়িঘড়ি উঠে একটু জলটল খেয়ে বন্ধুর সাথে হাঁটতে বেরোলাম গ্রামের সীমানায়। অস্তাচলের সূর্যের শেষ আলো তখনো দূরের পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে । রাতের ছায়া নামতেই সারা জঙ্গলে যেন ঝিঁঝিঁ আর অজানা জংলি পোকাদের বিরাট কলরব সারা উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছে । আদিম একটা পরিবেশ! এ যেন সভ্যতা থেকে কতদূরে চলে এসেছি! কোথায় বিংশ শতাব্দির ভারতবর্ষ ! কোথায় যে ঝাঁ চকচকে মুম্বাই শহর , আর কোথায় এই ছোট্ট অনামা অজানা পাহাড়ি গ্রাম! গ্রামে বিদ্যুতের আলোর ব্যাপার এমন জায়গাতে তো আশাই করা যায় না। হেঁটে হেঁটে ফিরে এলাম বাড়িতে। বাড়ির সামনে বেশ বড় খোলামেলা উঠোন। চারদিকে জঙ্গল। এই অন্ধকারে তা আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে। অন্যান্য বাড়িগুলোতেও আলো জ্বলে উঠেছিলো। তবে ল্যাম্পের ব্যাপার নেই। ছোটো ছোটো মশাল।

বন্ধুটি বেশ রসিক মানুষ। কিছুক্ষণ পড়েই তার আন্দাজ পেলাম আলোআঁধারিতে খাটিয়ে পেতে বসে আড্ডা মারার সময় । বলে, ওই যে দূরে টিলায় কেল্লাটা দেখছো— ওটা কিন্তু ঐতিহাসিক — অন্ততঃ আমাদের এই গ্রামের কাছে। যদিও ইতিহাসের পাতায় এর খোঁজ পাবে না । এই এলাকায় এক সময় বহু গ্রাম ছিলো এবং শিবাজীর সময়ে এ এক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিলো। মোগলরা এখানে বহু চেষ্টা করেও বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে অগত্যা ফিরে গিয়েছিল। এই গ্রামের মানুষরা ছিলেন ইতিহাসের প্রখ্যাত মারাঠা যোদ্ধা শিবাজী মহারাজের বাহিনীতে । বংশপরম্পরায় বীর যোদ্ধা সব। আজ এত ভরা জঙ্গল, মরা শশ্মান — এ দেখে বোঝা যাবে না। কিছুটা আন্দাজ পাবে আমাদের বাড়িগুলো দেখে। তুমি এসেই কিছুটা অবাক হয়ে গেছিলে তা দেখে। আসলে এই বাড়িগুলো এমন ভাবে বানানো হয়েছিলো কয়েকশো বছর আগে যুদ্ধের কথা ভেবেই — একে তুমি একসাথে বাড়ি , গুহা , মহীরুহ এবং গোলকধাঁধা সবই বলতে পারো । এই গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়ির সাথে অন্য বাড়ির সুড়ঙ্গ আর জঙ্গলের সুঁড়িপথে যোগাযোগ আছে এবং গুপ্তপথে আছে কেল্লার সাথে যোগাযোগ । এ বাড়ির মাটির তলায় আছে আরো দুটো তলা। কোনো কোনো বাড়িতে আরো বেশি। মাটির তলায় থাকতো খাবার , রসদ , অস্ত্রশস্ত্র , গোলাবারুদ। বাইরের লোকের , সে মোগল বাহিনী হোক আর যে-ই হোক, তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল সেইসব গুপ্তকক্ষ। আজ কালের গ্রাসে প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে ।

তোমাকে এমন একটা বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেখাব সব। তারপর একটা মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা হবে তোমার দেখো।

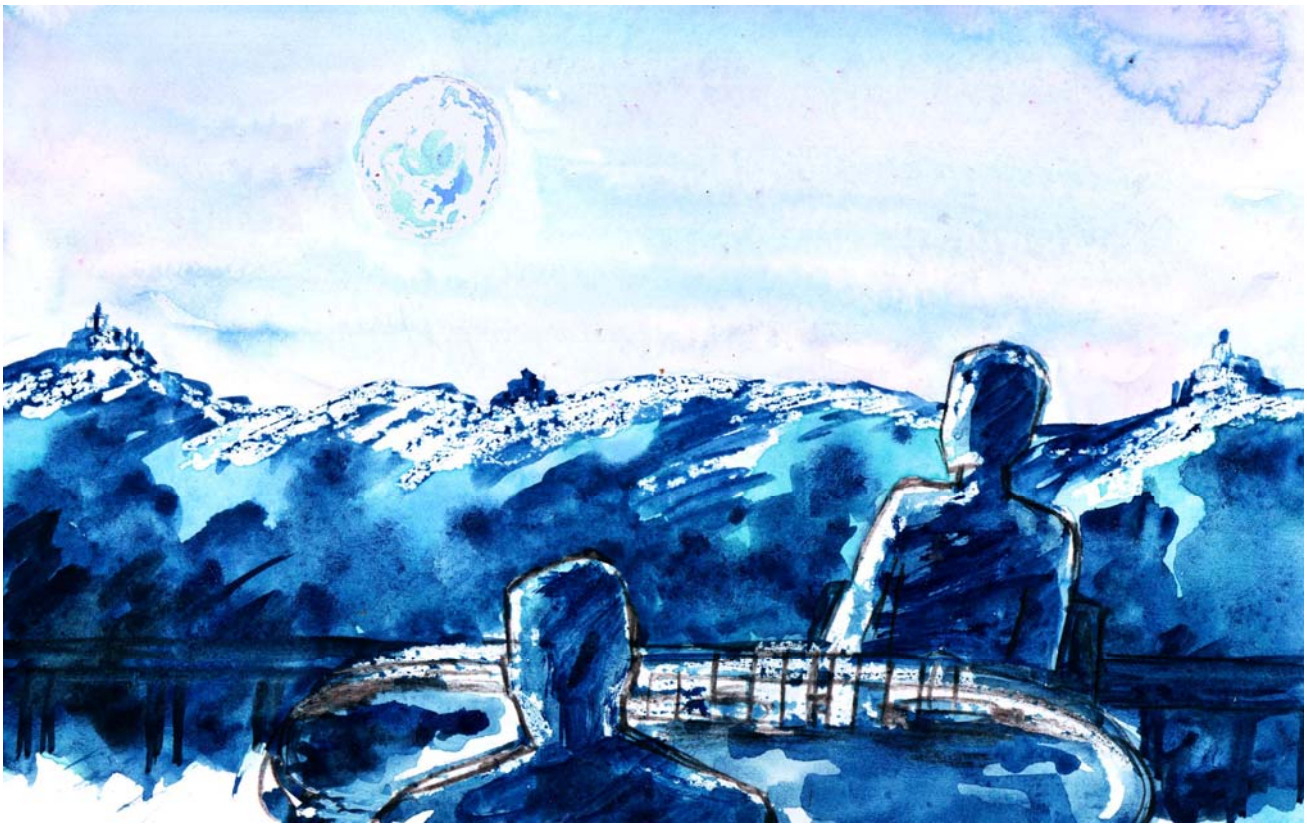

গল্পের ঘোরে টেরও পাইনি যে আমাদের উঠোনটা জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে কখন। চারদিকের নিস্তব্ধতা, আলো আধাঁরির খেলা আর ইতিহাসের ফেলে আসা গৌরবময় আর অজানা কথার গল্পগুলো শুনে যাচ্ছিলাম সেই মোহময় পরিবেশে ।

রাতের খাবারও চলে এলো খানিক বাদে। একই খাবার, সাথে কিছু তরল পানীয়। জানা গেল জংলি ফুলের থেকে বানানো। অপূর্ব তার স্বাদ ।

খাওয়াদাওয়ার পর বন্ধু আমায় নিয়ে এলো গ্রামের একটা বাড়ির সামনে। বাড়ির ভিতরে ঢুকেই প্রথমে মনে হলো যেন এক প্রাচীন গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। বিচিত্র এর পরিকল্পনা যা ভাষায় বোঝানো মুশকিল। একেবারেই গোলকধাঁধা। মশাল হাতে বন্ধুটির পেছনে পেছনে অন্ধের মতন চলতে থাকলাম।

এবার একটি বেশ বড় ঘরে ঢুকে দেখি তার একদিকে কাঠের এক বিরাট মালখাম্ব – ইংরেজিতে যাকে পিলার বলে – এবার সেই মালখাম্বটাকে জাপটে ধরে ধাপ বেয়ে বেয়ে চলে এলাম পাতাল ঘরের প্রথম তলায়। তার চতুর্দিকে সুড়ঙ্গ আর সুড়ঙ্গ। বহু বছর পর ভিয়াতনামের কুচি সুরঙ্গ দেখেছিলাম, কিন্তু এ সুড়ঙ্গগুলো তার থেকেও জটিল । এবার প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের চলা শুরু – এঁকে বেঁকে – এই সুড়ঙ্গ থেকে অন্য সুড়ঙ্গ এই করেই চলছে । অথচ এমনি এর পরিকল্পনা , যে আবদ্ধ লাগলেও গরম লাগছিল না একটুকও । সেই অন্ধের মতো চলতে চলতে শেষে আবার এক বড় ঘর আর আবার সেই মালখাম্ব । জাপটে ধরে ফের উঠেগেলাম দোতলায় একটা বেশ বড় ঘরে । সুসজ্জিত ঘর ছিল এক সময় বোঝা যায়। যেন

একটা ছোটোখাটো দরবার। হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। এবার বসতেই হলো । প্রাচীন সব আসবাবপত্র , যদিও অনাদরে তার জীর্ণ অবস্থা । এবার যা হলো তার জন্য আমি ঠিক তৈরি ছিলাম না আর এই অভিজ্ঞতা আরো কারো হয়েছে কিনা আমার সন্দেহ আছে ।

হঠাৎ আমার বন্ধু বলে উঠলো, “তোমায় এবার একা রেখে আমি যাচ্ছি আমাদের পূর্বপুরষের জিম্মায়। ভয় পেয়ো না। তোমার কোনো ক্ষতি হবে না । আমি সময় মতো চলে আসব । কিছুমাত্র চিন্তা কোর না ।” এই বলে বন্ধুটি একমাত্র আলোটি নিয়ে সেই গোলকধাঁধায়

হারিয়ে গেলো। ঘুটঘুটে অন্ধকারে অবাক হয়ে বসে রইলাম অজানার প্রতিক্ষায় । আমি ভয় পাওয়ার পাত্র নই এবং বন্ধুটিও আস্বস্ত করে গেছে । কতক্ষণ বসে আছি মনে নেই হঠাৎ সত্যি ভীষণ ভয় পেয়ে প্রায় বরফ হয়ে গেলাম। সারা শরীর একেবারে কেঁপে শক্ত হয়ে গেলো ,নড়াচড়া করার শক্তি নেই । অন্ধকারে বহু হিমশীতল হাত সারাশরীরে বুলিয়ে যেন আদর করলো । টের পেলাম সারাঘরে ক্রমশ বহু মানুষের আবির্ভাব হলো , কিন্তু তারা ইহলোকের নয় সেতো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল । মারাঠি , হিন্দি মেশানো ভাষায় অনর্গল সবাই কথা বলে চলেছে যেন । ক্রমশ আমাকে তারা ঘিরে এসে বসলো এবং পরিষ্কার করে আমার সাথে কথা বলা শুরু করলো । অল্পক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে গেলাম এবং ভালোই লাগছিলো এই নতুন অভিজ্ঞতা ।

গল্প শেষ হয়ে যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। চোখে রৌদ্রের ঝলকানিতে ঘুম ভেঙে গেলো। এ এক অন্য ঘর , অন্য বাড়ি। আমার বন্ধুর বাড়ি। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি হাসি হাসি মুখে বন্ধুবর আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে । গতরাতের অভিজ্ঞতা অপার্থিব এবং অভাবনীয় ছিলো । যেন স্বপ্ন দেখছিলাম। সব কথা তাকে বলতে হলো ।

প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার আগে বন্ধুকে অনুরোধ করে কাল রাতের সেই বাড়িটির সামনে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়ালাম। মনে মনে তাঁদের বিদায় জানালাম । বাড়িটা একেবারেই পরিত্যক্ত । সামনের ঘাসে বহু বুনোফুল ফুটে আছে । কয়েকটা তুলে বাড়ির আঙিনায় রাখলাম । তারপর এগিয়ে যেতে যেতে পেছনে ফিরে সেই অবিশ্বাস্য গ্রামটিকে আরো একবার দেখলাম । তারপর একসময় পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেলো গ্রামটা।

এই বলে দাদু থামলেন । একটু যেন উদাস মনে হলো তাঁকে।বললেন, “চলো বাবারা বাড়ি ফেরা যাক। অন্ধকার হয়ে আসছে।” দূরে চেয়ে দেখি পাহাড়ের গায়ে কার্শিয়াং-এর আলোগুলো ঝল্‌মল্‌ করছে ।

ছবিঃ মৌসুমী

ভ্রমণ

পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো

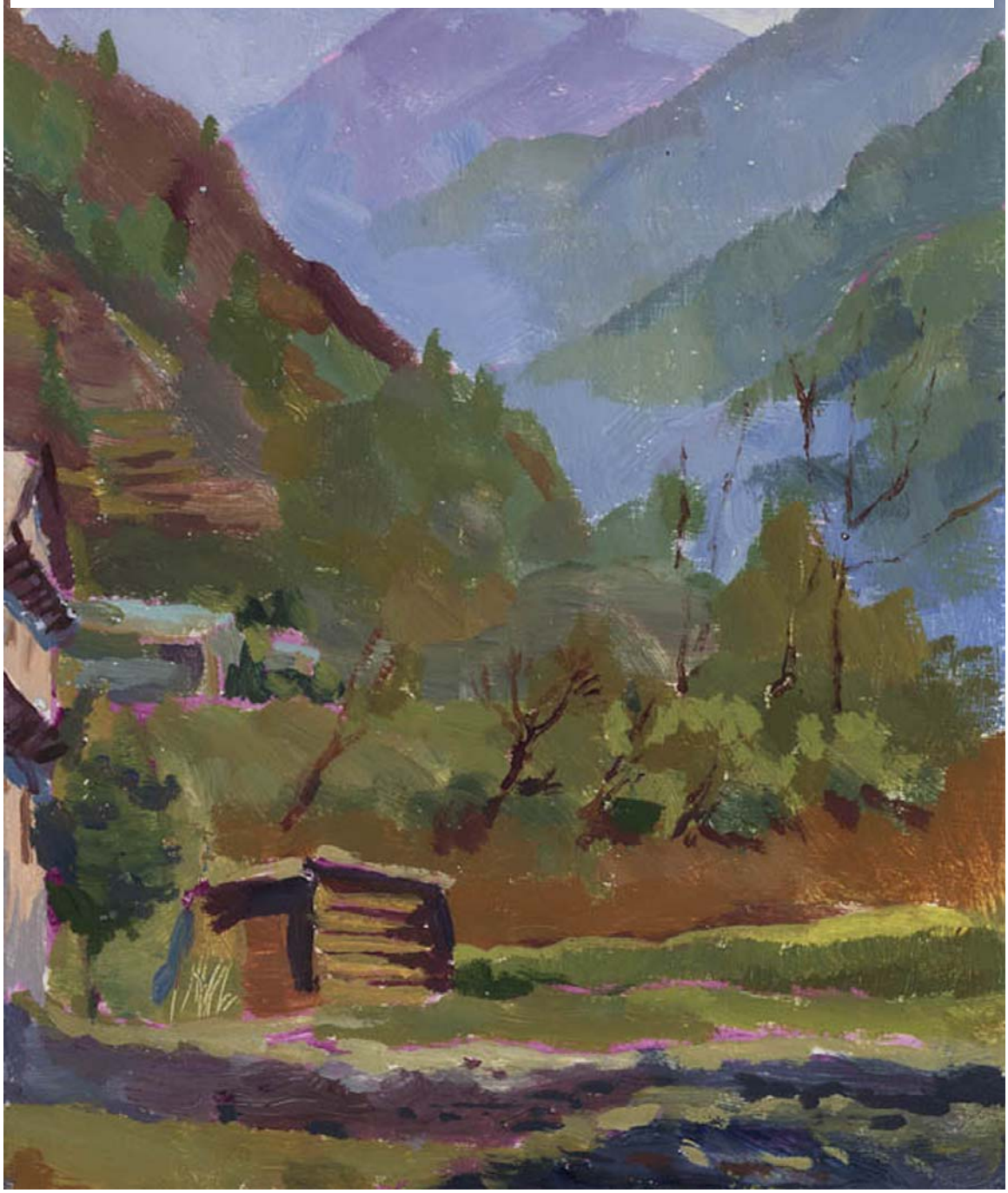

ইন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের উত্তরদিকে যে বিরাট পাহাড়শ্রেণী সেটাই হিমালয়। এই হিমালয় পাহাড়ের গায়ে গাড়ি চলা রাস্তার ধারে কাছে, আনাচে কানাচে, দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গ্রাম। কোনো কোনো গ্রামে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে সারা দিন এমনকি দুদিন তিনদিনও লেগে যায়। ছবির মতো সুন্দর সেসব গ্রাম। আরো সুন্দর সেখানকার মানুষজন।

এরকমই বেশ কিছু গ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেছে আমার, অনেকের সাথে, বেড়াতে বেড়াতে, নেহাৎ এক দুদিনের জন্যে। কোনো গ্রামে একবার, কোনো গ্রামে একাধিকবার। উত্তরাখন্ডের এমন কয়েকটা গ্রাম বেড়ানোর সাদামাটা গল্পই শোনাব এবার। সেসব গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী, গভীর জঙ্গল, সবুজ পাহাড়ি ঢাল, পাহাড়ের চূড়ার মাথার সাদা বরফ, রঙ বেরঙের জানা অজানা ফুল, নানান প্রজাতির পাখি, যদি কখোনো দেখতে ইচ্ছে করে তোমাদের!

তোমাদেরই মতো আমার এক ছোট্ট বন্ধু আমাকে এমনি এক পাহাড়ি গ্রামের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, " জানো, আমাদের দেশটা এতো বড়ো আর এত সুন্দর....."

গোনা

আগে উত্তরপ্রদেশ নামে একটাই রাজ্য ছিল। পরে এত বড়ো রাজ্যটা শাসন করার সুবিধের জন্য দুটো রাজ্যে ভাগ করা হল। পাহাড়ি যে অংশ তারই নাম হল উত্তরাখণ্ড। দেরাদুন তার রাজধানী। এই উত্তরাখণ্ড রাজ্যের একটা জেলার নাম চামোলি। সেই নামে একটা আধা শহরও আছে এই জেলাতে।

হরিদ্বার থেকে যে পথে বদ্রীনাথ, সে পথে প্রায় দুশো কিলোমিটার গেলে পড়বে চামোলি। অলকানন্দার পাড়ে। ভাগীরথী নদী বাদে হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলে অলকানন্দাই অন্যতম বড়ো নদী। দেবপ্রয়াগে এসে এই দুই নদী মিলিত হয়েছে। গাড়োয়াল ভূমিতে পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম হল দেবপ্রয়াগ। পুণ্যার্থীদের কাছে অন্যতম পবিত্র স্থান। অলকনন্দার যে পাড়ে চামোলি তার অন্যপাড়ে পাহাড়ের ওপরে গোপেশ্বর, চামোলি জেলার জেলা সদর। আগে চামোলিই ছিল জেলাসদর। কিন্তু বহুবছর আগে বন্যার সময় নদীপাড়ে থাকা চামোলি ভেসে যায়, অনেক ক্ষয়ক্ষতিও হয়। তার পরেই জেলাসদর অপেক্ষাকৃত আরও উঁচু জায়গা গোপেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়।

চামোলি শহর ছাড়িয়ে মূল জাতীয় সড়ক ধরে বদ্রীনাথের দিকে পাঁচ কিলোমিটার এগোলেই দেখা মিলবে বিরহীর। বিরহী একটা নদীর নাম। এসে মিশেছে অলকনন্দায়। জায়গার নামও এই বিরহী নদীর নামেই। বিরহীর পাড় ধরে ধরে জিপগাড়িতে ডান হাতি পথে আরো চোদ্দ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে, নিজমুলা পৌঁছে, তারপর জিপ থেকে নেমে আরও দু কিলোমিটার হেঁটে তবে পৌঁছনো যাবে গোনা গ্রামে।

ভাবছ, বাবারে বাবা কী হ্যাংগাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছলেই মন ভালো হয়ে যাবে তোমার। বিরহী নদীর পাড়ে পাহাড়ের কোলে কাঁখে এখানে ওখানে গাছপালার ফাঁকে ফোঁকরে গ্রামের বাড়িঘরদোর। নদীপাড়ে দু চারটে দোকানপাট, ওরা বলে বাজার, গোনাবগড়। বগড় মানে গ্রামের নীচে নদীপাড়ের যে জায়গা। সেখানে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে কারো না কারো। সে তোমাকে আদর করে চা খাওয়াবে। তারপর বলবে থেকে যাও আমাদের বাড়িতে।

একবার কী হোলো, অনেক রাতে গিয়ে পৌঁছলাম সেই বাজারে। একমাত্র যে চা দোকানটি খোলা ছিল, সেটিরও তখন ঝাঁপ বন্ধ হবার মুখে। আমরা পৌঁছনোর পরে তার মালিক

আমাদের একপ্রস্থ চা খাইয়ে দোকান আমাদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে দিব্যি বাড়ি চলে গেলেন। সে রাতে আমরা ওই দোকানঘরেই রাত কাটালাম। তোফা ব্যবস্থা, পাথরের মেঝের ওপর খড় পেতে, প্লাস্টিক বিছিয়ে , রবারের ম্যাট্রেস পেতে চমৎকার আস্তানা। মাথার ওপর কাঠের গুঁড়ির ওপর শনের আর চ্যাটালো স্লেট পাথরের আচ্ছাদন। সামনের দিকে টিন আর প্লাটিকের চালা। ঘরের দেয়াল পাথরের। পাথরের দেয়ালে কুলুঙ্গি বানানো। সেখানে মোমবাতি রাখার জায়গা। মোম জ্বালতেই ঘরময় আলো ছড়িয়ে পড়ল। আলো আবছায়ায় ভারি মনোরম হয়ে উঠল আমাদের রাতের আস্তানা। বাইরে হাওয়া চলছিল। ফলে খুব উঁচুতে না হলেও ঠাণ্ডা বেশ বেশি। রান্না করা হল দোকানের কাঠের উনুনে। ওরা বলেন চুলহা। বাইরের বারান্দার এককোণে সেই চুলহা। তিনদিক খোলা, মাথায় ছাউনি। ঠাণ্ডা ছিল বলে উনুনের পাশে বসে গরম গরম রুটি আর তরকারি খেতে কি যে ভালো লেগেছিল!

পরের দিন সকাল সকাল আমাদের ফিরে আসবার কথা। কিন্তু তা আর হল না। আমাদের তৈরি হবার আগেই দোকানি এসে গেলেন, গ্রামের আরও অনেকেই এসে গেলেন, তারা কেউ কেউ আমাদের চেনেন, কারো সাথে সদ্য আলাপ হল। সকলেই বললেন, “না না এখন যাওয়া চলবে না, বা রে বাড়িতে একবার যাবে না?” ফলে সকালে যাবার উদ্যোগ বানচাল হয়ে সারাদিন সবার বাড়ি ঘুরে ঘুরে শেষকালে ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে গেল।

কারও বাড়িতে কমলা লেবুর গাছ। কারও বাড়িতে কলাগাছের ঝাড়। কারও উঠোনে মুসুরির ডাল শুকোচ্ছে, কারও বা রাজমার দানা। অনেকের বাড়িতেই পোষা গরু, মহিষ, ভেড়া, মুরগি। আতিথেয়তা রাখতে একটু একটু করে সব বাড়িতে খেতে খেতে আমাদের পেট জয়ঢাক হয়ে গেল।

গ্রামের বাড়িগুলো কাঠের। যতটুকু কাঠ প্রয়োজন ততটুকু গাছই কাটা হয়। বনবিভাগের দেখিয়ে দেওয়া দাগ দিয়ে রাখা জঙ্গলের গাছ কেটে গ্রামের মানুষের মধ্যে ঠিক ঠিক ভাবে বিলি বন্দোবস্ত করা হয়। এতে জঙ্গল সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় আবার গ্রামের মানুষের প্রয়োজনও মেটে। গ্রামের মানুষেরাই নিজেদের প্রয়োজনে জঙ্গল রক্ষা করে, গাছ লাগায়।

জোহর সিং

ঘুরতে ঘুরতে এক বাড়িতে আমাদের বন্ধু হারিন্দর সিং বিষত—এর বাবার সঙ্গে দেখা। ওনার সঙ্গে আমাদের অনেকক্ষণ গল্প হল। রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে গল্প করতে করতে জোহর সিং,

হারিন্দরের বাবা, হঠাৎ বললেন, "তোমরা তো কলকাত্তায় থাকো, তোমরা কি ছোড়দাদাকে চেন?" আমরা অমনি সমস্বরে হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠলাম। জোহর বললেন, "সত্তর আশির দশকে ছোড়দাদা আসতেন, আমার সঙ্গে আলাপ ছিল। তখন আমার বয়েস কম। অনেক ঘুরেওছি পাহাড় জঙ্গলে ওনাদের সাথে।" ও হো ছোড়দাদা যে কে তা তো তোমাদের বলিনি। উনি হলেন বিদ্যুৎ সরকার। সবার ছোড়দা। দক্ষিণবঙ্গে ছোটোদের প্রকৃতিপাঠ শিবির শুরু করার অন্যতম কারিগর হলেন উনি। কেমনভাবে শিবির চালনা করা হবে, কী কী শেখানো যায় ছেলেমেয়েদের যাতে তারা আরও আনন্দ পায় আরও একটু প্রকৃতির কাছাকাছি আসে তা নিয়ে এখনো ছোড়দার ভাবনার অন্ত নেই। ছোড়দা এখন প্রায় বাহাত্তর কিন্তু যেকোনো যুবকের মতো সমান চনমনে। বিদ্যুৎ সরকার একজন দক্ষ পর্বতারোহীও বটে। পাহাড়ের টানে শুধু শৃঙ্গে আরোহণই নয়, পাহাড়ের গ্রামে গ্রামে কত যে ঘুরেছেন আর সেখানকার লোকেদের আপন হয়ে উঠেছেন তা বলাই বাহুল্য। আমরা মুগ্ধ হয়ে জোহর সিং-এর কাছে সে গল্প শুনি।

ফিরে আসবার সময় গোনাবগড়ের চালডালনুনতেল-এর দোকানদার প্রৌঢ় ভগবান সিংকে বিদায় জানানোর সময় পালটা বিদায় জানাবার বদলে উনি বিরহীর স্রোতের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "দেখো ওই যে নদী, ও কিন্তু শিবঠাকুরের অশ্রু। দেবী উমার বিরহে কাতর শিবঠাকুরের মনে খুব দুঃখ হল একবার। সেই দুঃখে শিবঠাকুরের দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে এল জল। অনেক উঁচু পাহাড়ের কোলে সেই চোখের জল থেকে তৈরি হল সাত সাতটা কুণ্ড। নাম হল সপ্তকুণ্ড। সেখান থেকে উৎপন্ন হল একটা নদীর নাম হল বিরহী। ওই যে বয়ে চলেছে, দেখো।"

ভগবান চুপ করে রইলেন। আমরা কথা না বলে ওঁর হাত ধরলাম। নিরুচ্চারে বলা হল, মনখারাপ করবেন না, আমরা আবার আসব। তারপর রওনা হলাম দু কিলোমিটার দূরে একটু উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে নিজমুলার দিকে, সেখানেই জিপ পাওয়া যাবে। চামোলি ১৯ কিলোমিটার।

এখন গোনা গ্রামের একটু খুব কাছ দিয়ে পাকা রাস্তা বানানো হচ্ছে। তার মানে এক দুবছরের মধ্যে, জিপে চড়ে সোজা পৌঁছে যাওয়া যাবে গোনা বগড়ে— সটান। গিয়েই ভগবান সিং-এর দোকানে বসেই হাঁক দিয়ে বলতে হবে, "হাঁ জি, মহারাজ! চায়ে পিলাইয়ে জলদি, গরমাগরম ।"

ছবিঃ মৌসুমী (ফটোগ্রাফ অবলম্বনে)
প্রচ্ছদ ছবিঃ সংগৃহীত
ক্রমশ

অজানা দুর্গ দালিং

অরিন্দম দেবনাথ

সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে কিছু ক্ষমতাবান মানুষ বা শাসক নিজেদেরকে পরিবার পরিজন সহ রাখতেন সুরক্ষার ঘেরাটোপে। বিশাল উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দিনরাত প্রহরায় থাকা এই আবাসকে বলা হয় দুর্গ বা কেল্লা। এই দুর্গ শুধুমাত্র সুরক্ষিত আবাসই ছিল না, ছিল ক্ষমতার প্রতীক। সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য দুর্গ। তাদের কোনোটা আকারে আয়তনে বিশাল আবার কোনোটা খুবই ছোট। কিন্তু দুর্গের মূল উদ্দেশ্যটা সব ক্ষেত্রেই এক; সুরক্ষা।

পৃথিবীতে এখন সম্ভবত আর এমন কোনো দুর্গ নেই যা শুধুমাত্র সুরক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। কারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে দুর্গ সমূহের নিরাপত্তাজনিত সেই উদ্দেশ্যটিই অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে । এখন কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে নির্ভুল নিশানায় যে কোনো কিছু ধ্বংস করে দেওয়া যায়। শয়ে শয়ে বছর পুরোনো এইসব দুর্গ এখন অধিকাংশই ধ্বংসস্তুপ। যেগুলো এখনো টিঁকে রয়েছে তা হয় কোনো মিউজিয়াম, পর্যটন কেন্দ্র, হোটেল বা সরকারী অফিস।

পৃথিবীতে যত দুর্গ আছে তার অধিকাংশই স্থাপত্যে বা গঠন বৈশিষ্টে একে অপরের থেকে আলাদা। তার কারণ মূলত ভৌগলিক অবস্থান, অধিপতির আর্থিক অবস্থা এবং সাম্রাজ্যের পরিধি। প্রত্যেকটি দুর্গই এক একটি ইতিহাসের খনি। কত যে জানা না জানা ইতিহাস ছড়িয়ে আছে প্রতিটি দুর্গের সাথে তার সীমা পরিসীমা নেই। মুস্কিল হল দুর্গের সাথে জড়িত ইতিহাস কোথাও সেরকম ভাবে লেখা নেই। তাই সব দুর্গের সব কাহিনী জানা যায় না। কিন্তু লোকগাথায় বা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া এই সব আজও শোনা যায় দুর্গের আশেপাশের বাসিন্দাদের মুখে।

সব দুর্গ অবশ্যই বিশাল আকৃতির ছিল না, অনেক দুর্গ আবার তৈরি হয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে বসবাসের জন্যে। এইরকমই একটি দুর্গ হল দালিং দুর্গ। ডুয়ার্সের চা বাগিচায় ঘেরা অম্বিয়াক উপত্যকায় প্রায় ৩৫০০ ফুট উঁচুতে ঘন জঙ্গলের মাঝে। তীরের ফলার মত এক আকৃতির পাহাড়ের মাথায় লুকিয়ে আছে দালিং দুর্গের ধ্বংসস্তুপ। তিন দিক খাড়া পাহাড়ের ঢালের বর্ম নিয়ে এক ভুটানি সর্দারের ব্রিটিশ সরকারের বিরূদ্ধে লড়াইয়ের সাক্ষি ওই দালিং দুর্গ। ভুটানের প্রাচীন ইতিহাস গুরুত্ব দিয়ে না লেখার ফলে ওই দুর্গের অধিপতির বা দুর্গের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নি। এই দুর্গ সম্পর্কে খুবই সামান্য উল্লেখ রয়েছে বেঙ্গল গেজেট, সিকিম গেজেট ও স্থানীয় বাসিন্দাদের লোককথায়।

শিলিগুড়ি থেকে ডামডিম গরুবাথান হয়ে যেতে হয় দালিং দুর্গে। বেঙ্গল গেজেটিয়ারে লেখা আছে দালিং। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে দালিং অপভ্রংশে হয়েছে দালিম। গরুবাথানের পর্যটন বাংলো দালিম হাটের কাছে চেল নদীতে মিশেছে দালিং খোলা নদী। ১৮৬৫ সালের আগে কালিম্পং সহ ডুয়ার্সের এই অঞ্চল ছিল ভুটানের অধীন। পাহাড়ি ঢালে তখন ফলত রাই, ধান ইত্যাদি শস্য। ব্রিটিশ সরকার ১৮৩৫ সালে সিকিমের সঙ্গে এক চুক্তি করে বার্ষিক ৩০০ টাকা খাজনার বিনিময়ে দোর্জেলিং বা দার্জিলিং এর দখল নেন ইংরেজ রাজকর্মচারীদের গ্রীষ্মাবাস বানানোর জন্যে। পাশাপাশি উদ্দেশ্য ছিল দার্জিলিংকে সামরিক ঘাঁটি বানিয়ে আশেপাশের

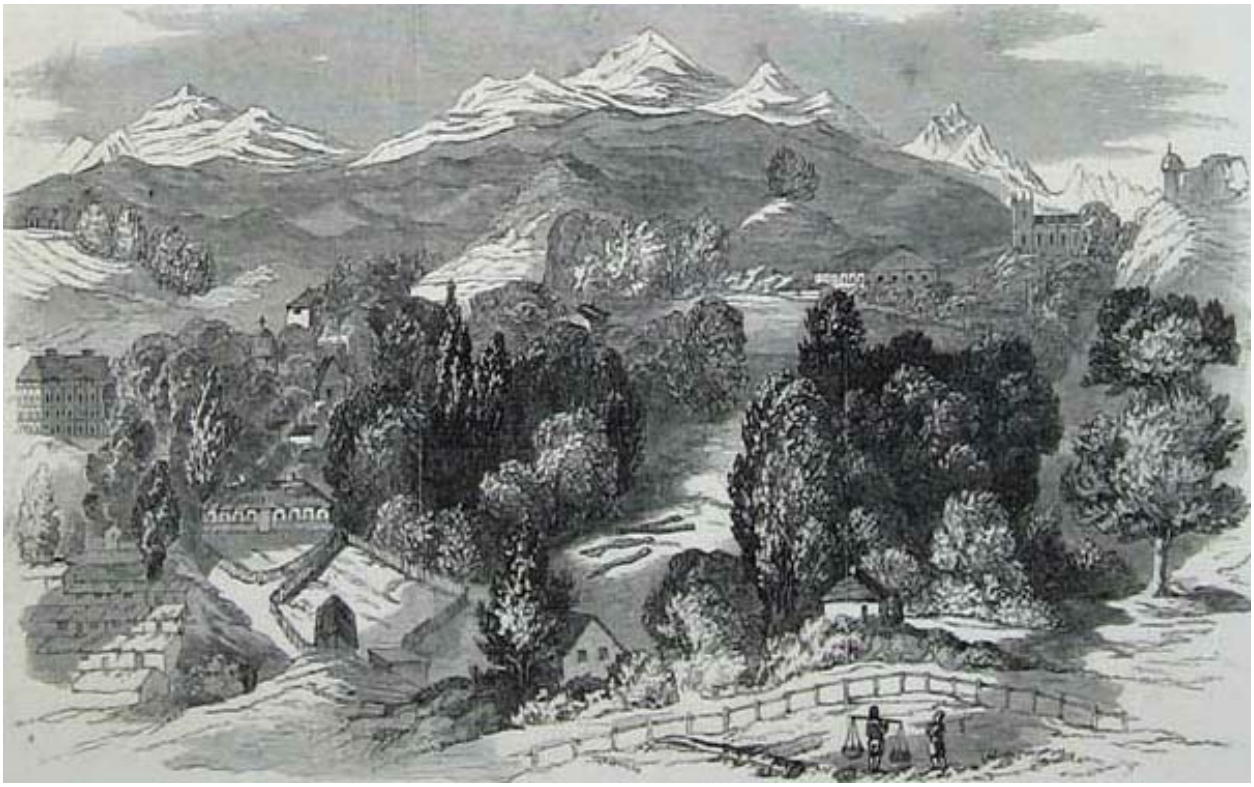

পার্বত্য রাজ্যগুলোর অপর নজর রাখা। বেঙ্গল গেজেট ও সিকিম গেজেট থেকে জানা যায় এক

ভুটানি সর্দার ব্রিটিশ আক্রমনের হাত থেকে বাঁচতে এই দালিং কেল্লা বানিয়েছিলেন। বহু ব্রিটিশ সৈন্য মারতে পারলেও সর্দারের মৃত্যু হয় ব্রিটিশদের হাতে ও সর্দারের স্ত্রী পাহাড়ের চূড়ার কেল্লার ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। বিস্তারিত প্রামাণ্য তথ্য না থাকলেও সর্দারের শৌর্যের কাহিনী রয়ে গেছে লোকগাথায়।

কী সেই লোককথা? এক ভুটানি সর্দারের কাজ ছিল শস্য শ্যামলা অম্বিয়াক ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে ভুটান রাজার পক্ষে খাজনা আদায় করা। এই ভুটানি সর্দারকে স্থানীয় অধিবাসীরা রাজার মর্যাদা দিত এবং খুব ভালোবাসত। ব্রিটিশরা এই অঞ্চলে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে খবর পেয়ে এই ভুটানি রাজা কয়েক হাজার লোকের সহায়তায় দালিং নদী, চেল নদী থেকে পাথর তুলে আনিয়ে দালিং টাঁড় পাহাড়ের মাথায় গড়ে তোলেন এই কেল্লা। বেঙ্গল গেজেটে প্রাপ্ত দালিং কোট কথার অর্থ তীরের ফলার মত আকৃতির পাহাড় বা স্থান। অম্বিয়াক অঞ্চলের কর্তৃত্ব ভুটানী সর্দার ছেড়ে না দেওয়ায় ব্রিটিশ সৈন্য এই কেল্লা আক্রমণ করলে কেল্লার ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে, বর্শা, তীর ইত্যাদি ছুঁড়ে সর্দারের সৈন্যেরা বহু ব্রিটিশ সৈন্য হত্যা করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। ব্রিটিশরা কেল্লা দখল করে। ভুটানি সর্দারের মাথা কেটে পাহাড়ের চূড়ার কেল্লা থেকে গড়িয়ে ফেলে দেয় ব্রিটিশ সৈন্যরা। রানি নিজের সম্মান বাঁচাতে কেল্লার ওপর থেকে খাড়া পাহাড়ের ঢালে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করে কেল্লা।

জঙ্গলের তলায় চাপা পড়া এই কেল্লার ধ্বংসস্তুপ এখনো রয়ে গেছে। পাথর সাজিয়ে তৈরি করা কেল্লার প্রাচীর। ভিতরে ছোট ছোট কুঠুরির নিদর্শন এখনো আছে। দালিং টাঁড় গ্রাম থেকে দালিংখোলা নদী পর্যন্ত খাড়া পাহাড়ের ঢালে পাথর দিয়ে তৈরি সিঁড়ি এখনো অনেকটাই অটুট। শোনা যায় প্রচুর দামি রত্ন ও জিমালা নামে একরকম মূল্যবান পাথর লুকোনো ছিল কেল্লার ভেতর। আর সেই ধনরত্ন ও মূল্যবান পাথরের খোঁজে স্থানীয় মানুষ কেল্লার ভেতর খোঁড়াখুঁড়ি করে কেল্লার অবশিষ্ট অংশকেও ধ্বংস করে ফেলে।

ছবিঃ সংগৃহীত

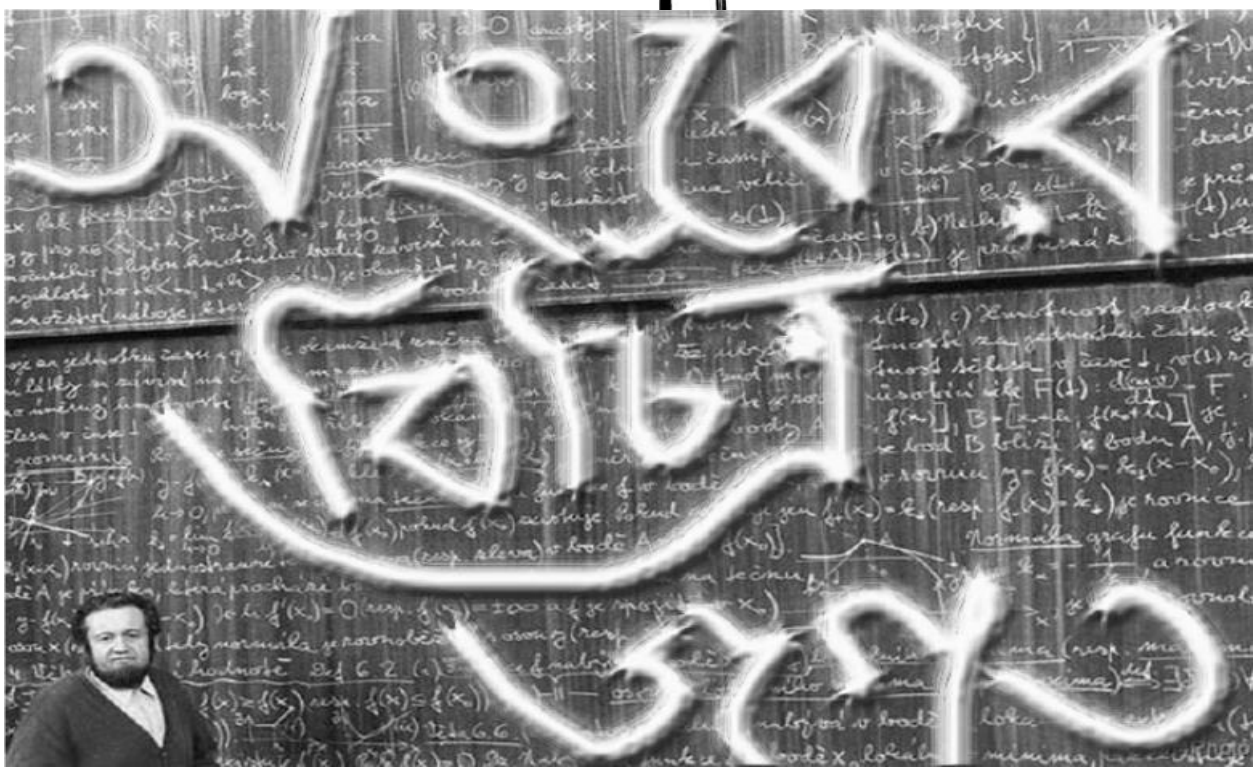

।৪।

অ্যান অ্যাডভেঞ্চার ইন ইন্ডিয়া

পিথাগোরাসের যে ত্রিভূজের সূত্র (যে কোন সমকোণি ত্রিভূজের দুটো বাহুর ওপর গড়ে তোলা বর্গাকার ভূমির মোট পরিমাণ ত্রিভূজের তৃতীয় বাহুর ওপর গড়ে তোলা বর্গাকার ভূমির পরিমাণের সমান হবে।) সে সূত্রও আসলে জমির মাপজোক সংক্রান্ত ব্যাপার। ভারতীয় শুল্বসূত্রের পুঁথিতে সেটা যে ছিল, সে কথা তো বললাম। এখন প্রশ্ন হল, এই গাণিতিক তত্ত্বের কথা পিথাগোরাস জানলেন কী করে? এর নানা উপায় হতে পারে। হয়তো পিথাগোরাস নিজেনিজেই ভেবে ফের সে সূত্রটা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন! অথবা এমন হতে পারে যে ভারত থেকে মিশর হয়ে এই জ্ঞান গিয়ে পৌছেছিল এই গ্রিক পণ্ডিতের দেশে! কিংবা পিথাগোরাস নিজেই হয়তো এ দেশে এসেছিলেন! কারণ, বইতে লেখে, আনুমানিক ৫৭০ খৃঃপূঃ তে জন্মানো সামোস-এর এই গ্রিক পণ্ডিত নাকি তরুণ বয়সে

> গল্পে বলে পিথাগোরাস নাকি ত্রিভূজের সূত্রটা আবিষ্কার করে এমন মজা পেয়েছিলেন যে দেবতার উদ্দেশ্যে একখানা ষাঁড় বলি দিয়ে ফেলেন। তবে সে গল্পের সত্যিমিথ্যে কেউ জানে না।

জ্ঞানের খোঁজে মিশর ও অন্যান্য দেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন আর সেই ঘোরাঘুরির শেষে গিয়ে ক্রোটনা-তে বসবাস করেন।

এবারে একটা বিখ্যাত গল্প বলবো। ওপরে তার নাম দিয়েছি। গল্পটা লিখেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দির বিখ্যাত সাহিত্যিক ও দার্শনিক ভলতেয়ার। আপাতদৃষ্টিতে এ গল্পের সঙ্গে ভারতের অংকের ইতিহাসের কোন সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও এ গল্প থেকে সে ইতিহাসের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর বের হয়ে আসবে। তবে সেসব কথা পরে হবে। আগে গল্পটা হোক। যারা শুধু অংক কষতেই ভালোবাসে, গল্প শুনলে যাদের গায়ে জ্বর আসে তারা এই অধ্যায়টা বাদ দিয়ে যেতে পারোঃ—

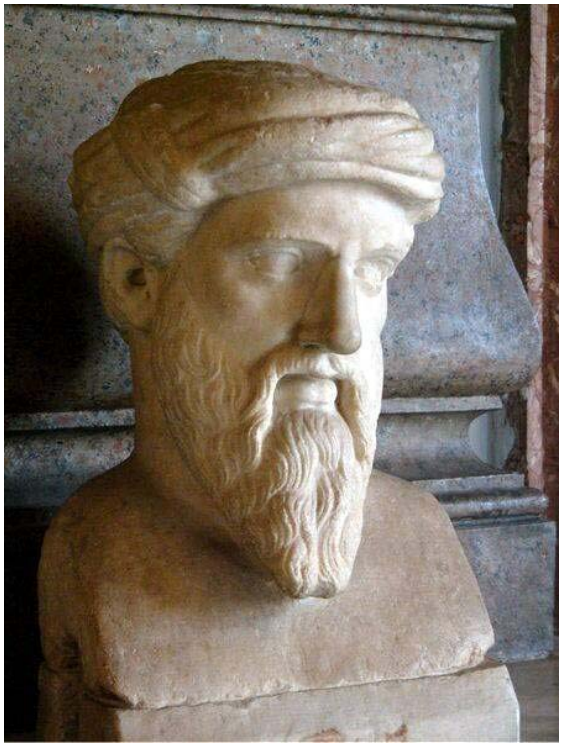

ভারতে থাকাকালীন পিথাগোরাস যে নাগা সাধুদের কাছে জীবজন্তু আর গাছপালাদের ভাষা শিখেছিলেন এ খবর তো মোটামুটি সকলেরই জানা। তা একদিন সমুদ্রের ধারে একটা মাঠে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তাঁর কানে এলো কে যেন বলছে, “ধুস, কেন যে মরতে ঘাস হয়ে জন্মালাম! দু ইঞ্চি লম্বা হতে না হতে একটা ভয়ংকর জন্তু এসে বড় বড় খুর দিয়ে আমায় মাড়িয়ে দ্যায়। সে ব্যাটার মুখের ভেতর আবার ধারালো কাস্তের সারি বসানো। তাই দিয়ে কেটে, ছিঁড়ে পিষে আমায় সে মহানন্দে পেটে পোরে। দুনিয়ায় বোধ হয় সেই ব্যাটা কাস্তেমুখো-র মত ভয়ংকর জীব আর দুটো হয় না।”

আরো খানিক দূর এগিয়ে পিথাগোরাস দেখেন একটা পাথরের ওপরে মুখখোলা একখানা ঝিনুক বসে আছে। সেটাকে তুলে নিয়ে খোলার ভেতরের তুলতুলে শরীরটাকে মুখে পোরবার তাল করেছেন, তখন শোনেন সে বলছে, “হে প্রকৃতি, তোমার তৈরি মাঠের ঘাস কতো সুখী জীব! একবার কেটে খেয়ে ফেললেও ফের গজায়। ওর মৃত্যু নেই। আর আমাদের কি দুর্দশা! দুটি খোলা ছাড়া আমাদের আর কোন আশ্রয় নেই। শয়তানের দল ব্রেকফাস্টের টেবিলে আমাদের খোলা খুলে খুলে ডজনে ডজনে পেটে চালান করে। যারা যায় তারা আর ফেরে না। ঝিনুকের কি দুর্ভাগ্যের জীবন! মানুষ কি ভয়ংকর জীব!”

তাই শুনে পিথাগোরাস ভারী দুঃখ পেয়ে সজল চোখে ঝিনুকটার কাছে ক্ষমাটমা চেয়ে তাকে পাথরের ওপরে নামিয়ে রেখে চলে গেলেন।

ঘাস আর ঝিনুকের কথাবার্তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে শহরে ফেরবার পথে পিথাগোরাস দেখলেন, মাকড়শা মাছি খাচ্ছে, ছোট পাখিতে মাকড়শা খাচ্ছে, বাজপাখি ছোট পাখির ওপর ছোঁ মারছে। দেখেশুনে পিথাগোরাস ভাবলেন, "হুম্! এরা কেউ দার্শনিক নয় বুঝতেই পারছি। কেউই মরতে ভালোবাসছে না।"

শহরে এসে ঢুকতে না ঢুকতে একদল লোক মহা হৈচৈ বাধিয়ে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে তাঁর গায়ের ওপর দিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।যেতে যেতে সব বেজায় চ্যাঁচামেচি জুড়েছে, "চমৎকার, আহা চমৎকার। এই ব্যবস্থা এনাদের একেবারে উপযুক্ত হয়েছে।"

পিথাগোরাস মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলোবালি ঝারতে ঝারতে পথের একপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকজন তখন রাস্তা জুড়ে দৌড়োচ্ছে আর বলাবলি করছে, "আহা, এদের জ্যান্ত সিদ্ধ হতে দেখতে কি যে আনন্দ হবে!"

পিথাগোরাস প্রথমে ভাবলেন এরা নিশ্চয় মুসুর ডাল বা অন্য কোন সবজির কথা বলছে। তারপর একে তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, মুসুর ডাল নয়, দুজন মানুষকে সেদ্ধ করবার ফন্দি করা হচ্ছে। এই শুনে পিথাগোরাস বেজায় খুশি হয়ে ভাবলেন, এই মানুষ দুজন নিশ্চয় খুব বড়ো দার্শনিক হবেন। পুরোন কাপড়ের মত নিজেদের পুরোন শরীর ত্যাগ করে তাঁরা নতুন শরীর ধারণ করবেন। তাঁদের আনন্দে তাই সারা শহর আনন্দ করছে। বটেই তো , বটেই তো! বুদ্ধিমান জীবের মাঝে মাঝে ঘরবাড়ি পালটাতে তো ভালো লাগাই উচিৎ।

জনতার সঙ্গে মিশে পিথাগোরাস গিয়ে পৌছোলেন শহরের একেবারে মাঝখানের চক এলাকায়। সেখানে একটা বিরাট কাঠের আগুন জ্বালানো হয়েছে, আর তার একপাশে একটা বেঞ্চি পাতা। বেঞ্চিটার নাম আদালত। বেঞ্চির ওপরে কয়েকটা বিচারক বসে ছিলো। তাদের মাথায় টুপি, হাতে একটা করে গরুর লেজ ধরা। টুপির ফাঁক দিয়ে তাঁদের গাধার মতন লম্বা লম্বা কান বের হয়ে আছে।

যা হক, এই বিচারকদের মধ্যে পিথাগোরাসের বন্ধু এক সাধু ছিলো। তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে, ভারতের সাধু সামোয়ার সাধুকে বললো, "এই দুই ভারতীয় মোটেই তাদের শরীরটা পাল্টাতে আগ্রহী নয়। আমার সঙ্গী বিচারক বন্ধুগণ এঁদের আগুনে পোড়াবার বিধান দিয়েছেন। কারণ, এঁরা দুটি বিরাট অপরাধ করেছেন। প্রথম, এঁরা বলেছেন, দিনদুনিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি নয়। দ্বিতীয়, এঁরা বলেছেন মরার সময় গরুর লেজ ধরে থাকবার চেয়েও সারাজীবন ভালো কাজ করা , স্বর্গে যাবার বেশি ভালো কায়দা। এহেন ভয়াবহ অধর্মের কথা শুনে শহরের মায়েরা-

বোনেরা এমন ক্ষেপে গেছেন যে সারা শহর একযোগে দাবি করেছেন এঁদের আগুনে পুড়িয়ে যমালয়ে পাঠানো হোক।" পিথাগোরাস এইবার বুঝতে পারলেন, ঘাসই হোক কি দার্শনিকই হোক সবাই সবাইকে পারলেই মারতে চায়। তা , তারপর তো তিনি সবাইকে "হিংসা করা পাপ, অপরকে সহ্য করো," এই সব অনেক কথা বুঝিয়ে সুজিয়ে লোকদুটোর প্রাণ বাঁচালেন।

তারপর ভারত ছেড়ে 'ক্রোটোনা' গিয়ে তিনি এইসব অহিংসা, সহনশীলতার কথা প্রচার করতে শুরু করতে এক ব্যাটার আর সহ্য হলনা। তাঁর কথা জ্ঞানবাণী শুনে বেজায় হিংস্র হয়ে গিয়ে সে পিথাগোরাসের বাড়িশুদ্ধু পুড়িয়ে দিল একদিন।

পিথাগোরাস পরিব্রাজন শেষ করে ক্রোটনায় গিয়ে বসবাস করে একটা নতুন ধর্ম তৈরি করেছিলেন। তার গোড়ার একটা তত্ত্ব ছিল যে প্রত্যেক আত্মা মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু হয়ে বারংবার জন্ম নিয়ে চলে। এই তত্ত্বটা সে সময়ের ভারতের হিন্দুধর্ম ও সদ্য গড়ে উঠতে থাকা বৌদ্ধ , জৈন এইসব ধর্মেরও মূল কথা ছিলো কিন্তু। কাজেই ভলতেয়ারের গল্পের মূলে কিছুটা সত্যি থাকলেও থাকতে পারে। তাই যদি হয় তাহলে, পিথাগোরাস ভারতে এসেছিলেন যখন, তখন ত্রিভূজের সূত্রটাও এখান থেকে শিখে গিয়েছিলেন সে কথা ধরে নেয়া যেতেই পারে, কী বলো?

ক্রমশ

মাথে মে ট্রিকস

দু অংকের সংখ্যার বর্গ বের করাঃ

ধরো ৩৭-এর বর্গ বের করতে হবে।

স্টেপ ১-- ৩৭ এর সবচেয়ে কাছের দশের গুণিতক হল ৪০।সেটা ৩৭ এর থেকে ৩ বেশি।

স্টেপ ২—এবারে ৩৭-এর থেকে ৩ কম গোনো। পাবে ৩৪।

স্টেপ ৩—৩৪x৪0=১৩৬০

স্টেপ ৪- ৩৭ , ৪০-এর থেকে ৩ কম। ৩ এর বর্গ হবে ৯।

১৩৬০+৯=১৩৬৯ (উত্তর)

নানান দেশের এক দুই তিনঃ

হিব্রু ভাষায় এক দুই তিনকে এইরকম নামে ডাকেঃ

১=আলেফ (א), ২=বেট(ב), ৩=গিমেল (ג), ৪= দালেত(ד),৫=হেই(ה), ৬=ভাভ(ו),
৭=জায়িন(ז), ৮=হেট(ח), ৯=টেট (ט) ১০=ইউড(י)

ছবিঃ সংগৃহীত

ভাস্কর

টুপুর

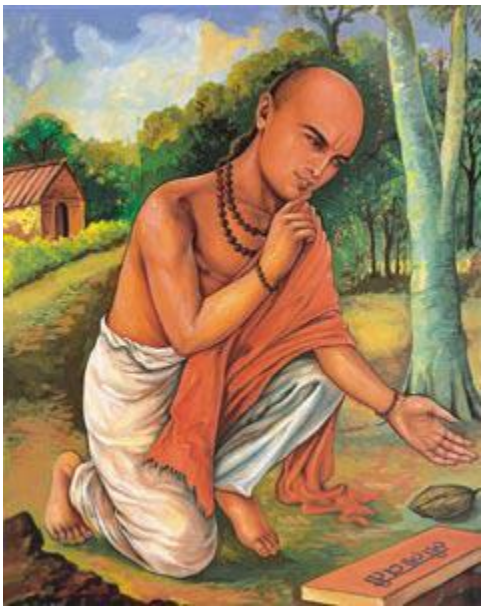

ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভাস্কর হলেন আধুনিক গণিতের জনক। তাঁর দেওয়া সূত্র ধরে আজকের দুনিয়ায় পাটিগণিত ও বীজগণিত চর্চিত হয়। এই সব সুত্রই ভাস্করের নাকি তাঁর পরিবারের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত গণিতচর্চার ফল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

আজকের মহারাষ্ট্রের সহ্যাদ্রি পাহাড়ের বিজদ্রাবিড় এলাকায় ১১১৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মে ছিলেন ভাস্কর। পিতা মহেশ্বরও গণিতজ্ঞ ছিলেন। আবার ভাস্করের পুত্র লক্ষীদার ও পৌত্র গঙ্গাদেব দুজনেই জ্যোতির্বিদ ও অঙ্কবিদ ছিলেন।

ভাস্করের সামগ্রিক কাজ মূলতঃ দুটো আলাদা আলাদা সংকলনে পাওয়া যায়। সংকলন দুটি যথাক্রমে ১১৫০ খ্রিষ্টাব্দে লেখা সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও ১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দে লেখা করণ-কুতুহল। এই দুই সংকলনের মধ্যে সিদ্ধান্ত শিরোমণিই দুনিয়াকে আজও অঙ্ক শেখায়।

সিদ্ধান্ত শিরোমণি চার খণ্ডে সংকলিত। প্রথম খণ্ড লীলাবতী, দ্বিতীয় খণ্ড বীজগণিত, তৃতীয় খণ্ড গ্রহগণিতাধ্যায়, চতুর্থ ও শেষ খন্ড হলো গোলাধ্যায়। লীলাবতী মূলতঃ পাটিগণিতের বই। বীজগণিতে স্থাণ পেয়েছে বীজগাণিতিক ধারণা। গ্রহগণিতাধ্যায়ের বিষয় গ্রহের, উপগ্রহের গতিপথ। গোলাধ্যায় গোলক সংক্রান্ত গণনার আকর।

পাটিগণিতের বই লীলাবতীতে মোট ২৭৮টি শ্লোক স্থান পেয়েছে। বইটি ভাস্করের মেয়ে লীলাবতীর নামে ও তাঁকেই উৎসর্গীকৃত। এতে মূলত পূর্ববর্তী গবেষক আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধরের দেওয়া গাণিতিক ধারণাকেই উপস্থাপন করা হয়েছে। এই খণ্ডে রয়েছে ভর, ওজন এবং অন্যন্য পরিমাপ। রয়েছে রৈখিক সমীকরণগুচ্ছের ৮ রকম সমাধানসূত্র। ২০ রকম পাটিগাণিতিক গণন পদ্ধতির বিবরণও পাওয়া যায় এই বইতে। এই খণ্ডে গাণিতিক সমস্যা দেওয়া আছে দ্বিতীয় ঘাতের অসমীকরণেরও। ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র এবং গোলক, শঙ্কু, পিরামিডের আয়তন নির্ণয়ের সূত্রও দেওয়া আছে এই সংকলনে। মুঘল সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় এই খণ্ডের ফার্সি অনুবাদ করেছিলেন আবুল ফজল ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে।

বীজগণিত খণ্ডে মোট ২১৩টি শ্লোক আছে। এই খণ্ডের উপজীব্য হলো শূণ্য আছে এমন সব সমীকরণ সমাধান করার নিয়ম। তার সাথে আছে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা ও পরিমাণের ধারণা। এমনকি এই খণ্ডে আলোচিত হয়েছে সংখ্যাতত্ত্বে অসীমের স্থাণ, তার সাথে সংখ্যা ও পরিমাণ যোগ করার বা তা থেকে বিয়োগ করার পরিণতি। এই সংকলন দ্বিতীয় ঘাতের অসমীকরণের বিজগাণিতিক ও জ্যামিতিক সমীকরণ নিয়েও আলোচনা করেছে। এই বই থেকেই প্রথম গাণিতিক চিহ্ন ও সংকেতের ব্যবহার শুরু হয়। ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আতাউল্লাহ রুশদি এই খণ্ডের ফার্সি অনুবাদ করেছিলেন।

গ্রহগণিতাধ্যায়ের সামগ্রিক আলোচনা বরাহমিহিরের সংকলন সূর্যসিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। গোলাধ্যায় এক যুগান্তকারী সংকলন। এই খণ্ডেই ভাস্কর পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতের মানে পাই (π)-এর দুটি মান বলেছিলেন।

ভাস্করের দেখানো পথ ধরেই আজকের অঙ্ক চলেছে। আধুনিক সভ্যতায় তাঁর গণিতচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

ছবিঃ সংগৃহীত

বিচিত্র জীবজগত

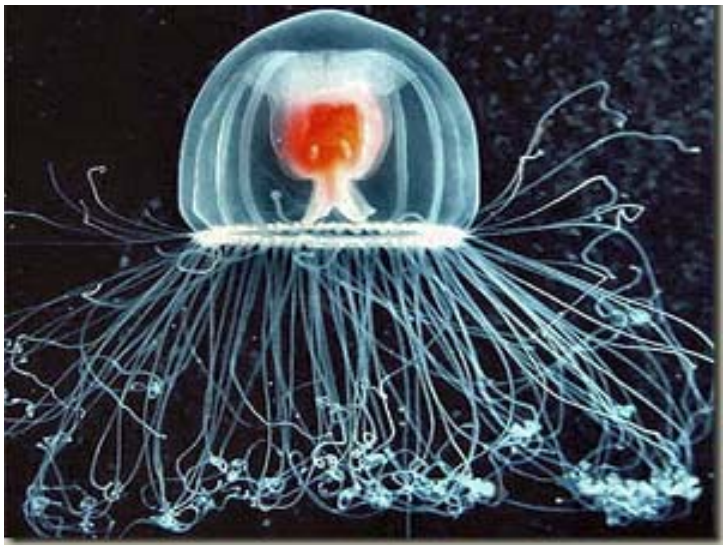

একবার একটা গল্পে পড়েছিলাম, কোন এক দেশে নাকি আজব সব মানুষ থাকে। তাদের যেই চল্লিশ বছর বয়েস হয় অমনি তাদের বয়স কমতে শুরু করে আর তারা ফের ছোট ছেলেমেয়ে হয়ে যেতে শুরু করে। পাকা চুল কাঁচা হয়, দাড়িগোঁফ অদৃশ্য হয়, ফুল প্যান্ট থেকে হাফপ্যান্ট, তারপর কাঁথা, তারপর একেবারে ছোট বাচ্চা হয়ে ওঁয়াও , ওঁয়াও, তারপর ফের তারা বড় হতে শুরু করে। আবার চল্লিশ বছরে পৌঁছে যাবার পর ফের ছোট হতে থাকে তারা। এইভাবেই তারা নাকি সবসময় বেঁচে থাকে।তেমন কোন মানুষের দেশের খোঁজ এখনো আসলে না পাওয়া গেলেও এমন একটা প্রাণীর খবর মিলেছে যারা সত্যি সত্যি একবার বড়ো হয়ে গিয়ে ফের ছোট হয়ে যায়, আর এমনি করেই চিরকাল বেঁচে থাকে। আজ তাদের গল্প।

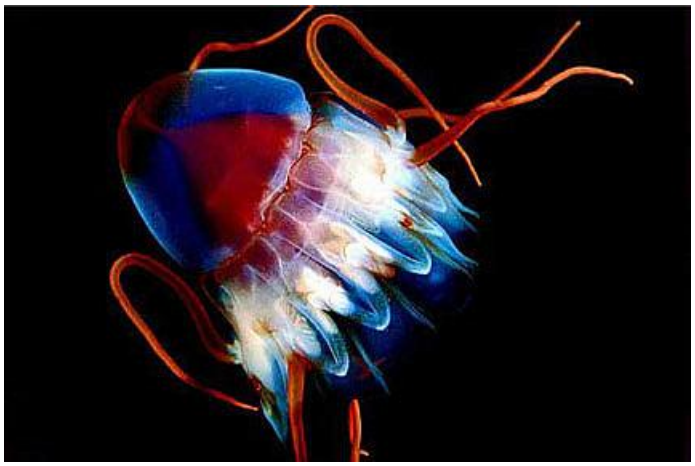

সাধারণত সব প্রজাতির জেলিফিশেরই সদ্য ডিমফোটা বাচ্চারা তাদের মায়ের মুখের ভেতর থাকে। একটু বড়ো হলেই তারা সাঁতারু ‘প্ল্যানুলা’ তে বদলে গিয়ে জলের ওপরে ভাসতে থাকে। কয়েকদিন এইভাবে ভাসবার পর আস্তে আস্তে জলের নিচে তলিয়ে গিয়ে প্ল্যানুলা কোন পাথরের গায়ে নিজেকে আটকে ফেলে।এসময় তারা বদলে যায় ‘পলিপ’এ।

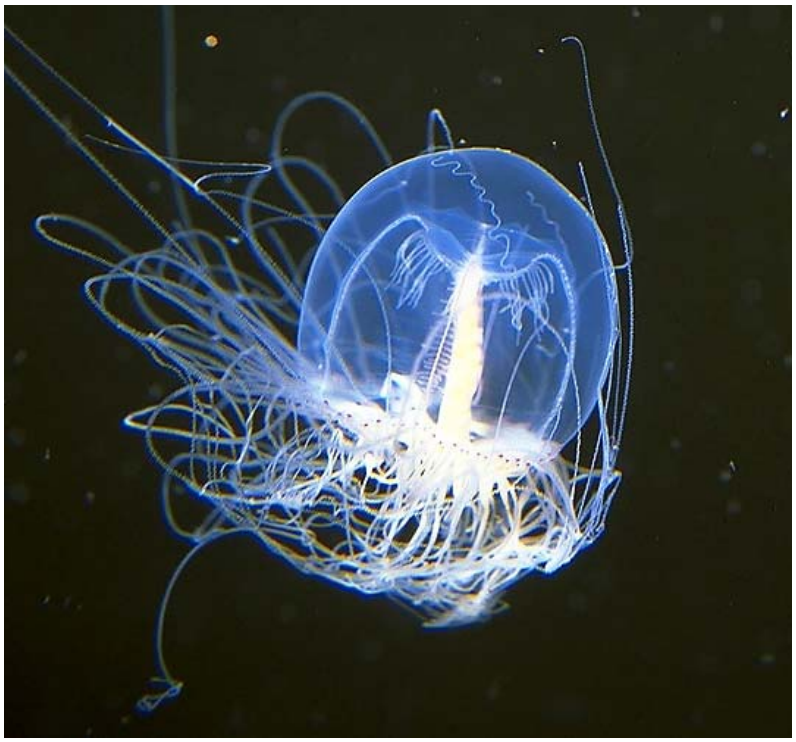

তারপর এক একটা পলিপ থেকে তৈরি হয় অনেক পলিপ। বেশ কিছুদিন গেলে পরে পলিপ থেকে নল, ছাতা, সুতো(ফ্ল্যাজেলা) এইসব বের হয়ে তা গোটা জেলি ফিশ-এ (এই দশাটাকে বলে মেডুসা) বদলে যায়।ওদিকে তাদের বাবা মায়েরা তাদের জন্ম দিয়ে তো বুড়ো হয়ে যায়।আস্তে আস্তে বুড়োরা মরে গিয়ে তরুণ জেলিফিশেদের জায়গা ছেড়ে দেয়।

তবে কিনা এক আছে জাদুকর জেলিফিশ। তার নাম টুরিটপসিস নিউট্রিকুলা। আর সব প্রজাতির জেলিফিশের বাবামায়েরা যখন ছেলেপিলে জেলিফিশরা জন্মে গেলে বুড়ো হয়ে মরতে বসেছে, টুরিটপসিস নিউট্রিকুলার বাবা মায়েরা তখন এক নতুন জাদু দেখাতে শুরু করে। প্রথমেই তাদের বিরাট ছাতার মত শরীরটা ক্ষয়ে গিয়ে ফের ছোট্ট হয়ে যায়, তারপর সুতোর মত দেখতে সাঁতার কাটবার অঙ্গ ফ্ল্যাজেলাগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়, তারপর ছোট্ট শরীরটা জলের মধ্যে ডুবে গিয়ে ফের বাচ্চা পলিপ হয়ে পাথরের গায়ে নিজেকে আটকে ফেলে। তারপর কী হয় জানতে হলে তিন নম্বর প্যারাগ্রাফ থেকে ফের পড়ো। পাশে যে ছবিটা দিয়েছি সেখান থেকে একটা

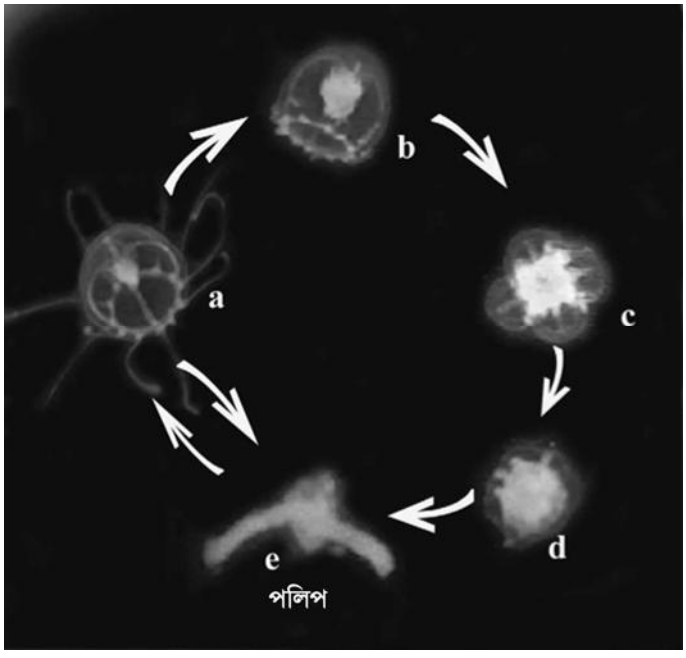

আন্দাজ করতে পারবে কেমন করে বারবার বৃত্তাকার পথে তারা বড়ো হবার পর ফের ছোট হয়ে গিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকে।

আর আমরা বাকি যে দুর্ভাগা জীবজন্তুরা রয়েছি পৃথিবীতে তাদের জীবনটা চলে একটা সরলরেখায়; এইভাবে—

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন , শুধুমাত্র যে পরিণত বয়সের টুরিটপসিস নিউট্রিকুলা এমনটা করতে পারে তা নয়, যেকোন বয়েসি টুরিটপসিসই ইচ্ছে করলেই ফের ফিরে যেতে পারে তার পলিপ দশার ছেলেবেলায়। কেমন করে এটা ঘটে? আসলে এই জাতের জেলিফিশেরা, এক অজানা কায়দায় নিজেদের দেহের পরিণত কোষগুলোকে বদলে দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে জন্মের সময়কার কোষের দশায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন ট্রান্সডিফারেনশিয়েশান। তবে কিনা জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়াটার বিস্তারিত পদ্ধতি এখনো মানুষের বুদ্ধির বাইরে।

আহা রে আমাদের যদি এমন হত! বিশেষ করে আমাদের পটো, বাঘাদের মতো অনেক বদমাশ ছেলেপিলেই যেই না কেজি টু ক্লাশ ওয়ানে ওঠবার বয়স হতো অমনি, তাড়াতাড়ি ফের নিজেদের ছোট্ট করে একেবারে খুদে বদমাশে পালটে নিতো, তারপর ফের মায়ের কোলে বাবার কোলে চেপে বড়ো হয়ে উঠতো। তারপর ফের যেই না কেজি টু পাশ করা অমনি ফের-----

(চুপি চুপি একটা খবর দিই। জয়ঢাকের বুড়ো সম্পাদকও কিন্তু কায়দাটা শেখবার তালে আছে। সন্ধান পেলেই এক লাফে একেবারে পাঁচ বছরেরটি হয়ে যাবে সে। তখন কী মজা! ইশকুল, অফিস, কিচ্ছু নেই!! সারাদিন শুধু খেলা, আর রাত্তিরবেলা মায়ের কাছে শুয়ে আদর খাওয়া। উঃ, ভাবলেই মজা লাগছে।)

ছবি সংগৃহীত

টেকনো টুকটাক

ছবিঃ সংগৃহীত

কুমির মাউস। চোখদুটো হল মাউস-এর বোতাম।

টেডি বেয়ার পেন ড্রাইভ

খাটের তলায় কলমটা কোথায় হারিয়ে গেলো দেখতে হলে আর নিচু হয়ে ঢুকতে হবে না। সরু নলটাকে তলায় ঢুকিয়ে দাও, তাহলেই স্ক্রিনে ফুটে উঠবে খাটের তলার ছবি। সেখান থেকে কলমটাকে খুঁজে নাও। দাম দশ হাজার টাকা।

বনের ডায়েরি

বালরীগ্রামের বাঘ

জে জে দত্ত

১৯৫৫ সাল। আমি তখন হারদা ডিভিশনে ডি এফ ও। আমার হেডকোয়ার্টার ছিল টেমারনি নামে ছোট একটা জায়গায়। প্রতিবেশী অন্য সরকারী লোক বলতে শুধু এলাকার নায়েব তহশিলদার আর থানেদার। ফলে সামাজিকতা, মেলামেশা এসবের সুযোগ ছিলো না বিশেষ। ছুটির দিনে সময় কাটতো স্ত্রীর কাছে গান শিখে আর সুযোগ পেলেই শিকার করে।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার কলেজে পড়া ছোট ভাই আমার কাছে টেমারনিতে বেড়াতে এল। তার খুব ইচ্ছে আমার বাঘ শিকার দেখবে। দুমাস ধরে, যেখানে যাই, সে পেছন পেছন ঘোরে। কিন্তু শিকার আর হয় না। এমনি করে তার ছুটি প্রায় যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন ফের একবার বের হয়ে পড়লাম সবাই মিলে। ভাইকে বাঘ শিকার দেখাবার শেষ চেষ্টা একটা করে দেখা যাক।

তখন গ্রীষ্ম শেষ হয়ে আসছে। বন একেবারে শুকনো। ঘুরতে ঘুরতে এসে ঘাঁটি গাড়লাম মগরধা বলে একটা বন গ্রামে। সেখানে তখন দেখি রেঞ্জ অফিসারও পরিদর্শনে এসেছেন।

সেদিন সন্ধেবেলা সবাই মিলে বসে গল্প করছি এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল, দূর থেকে দুটো লোক এদিকে আসছে। তাদের মধ্যে একজনের দুপাশে দুলে দুলে দুলকি চলনটা আমার ভীষণ চেনা ঠেকছিলো। আর একটু কাছে আসতে দেখি আমার ভুল হয় নি। ভদ্রলোক আমার বন্ধু ডক্টর বিক্রম মারোয়াই বটে । বিক্রম তখন নাগপুর মেডিকেল কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট

প্রফেসর। এই জঙ্গলে না বলেকয়ে সেই নাগপুর থেকে তার হঠাৎ আবির্ভাবে একটু অবাকই হয়ে গেলাম। তারপর শোনা গেল, অনেক ঝামেলা করে বিক্রম আমায় খুঁজে বের করেছে। প্রথমে টেমারনিতে এসে আমার খোঁজ করেছে। তারপর, আমি মগরধায় আছি খবর পেয়ে বাসে করে রাহাতগাঁও অবধি এসেছে। সেখান থেকে আর বাস আসবে না। কাজেই গরুর গাড়িতে আরো খানিক পথ এসে শেষ দু মাইল পথ পায়ে হেঁটে বন পেরিয়ে এসে পৌঁছেছে মগরধায়। একেই বলে বন্ধুপ্রীতি!

পরদিন বিকেলে ভাই আর ডক্টর মারোয়াকে নিয়ে গরুর গাড়িতে শিকারে বেরোলাম। খানিক দূর গিয়ে সামনের ঘন জঙ্গলের মাথা থেকে তিতিরের ডাক শোনা গেল। লুকিয়ে বসে ডাকছিলো । দেখা যাচ্ছিলো না। ঠিক করলাম শব্দভেদি গুলি ছুঁড়বো। তিতিরের ডাকের দিকে তাক করে বারো বোরের বন্দুক দিয়ে ছররা গুলি ছুঁড়ে দিলাম জঙ্গলের মধ্যে। ওর একটা সুবিধে হল, কার্তুজটা নল থেকে বেরিয়ে একটু দূরে গিয়েই বেশ খানিকটা এলাকা জুড়ে ছোট ছোট পেলেট ছড়িয়ে দেয়। ফলে মোটামুটি একটা নিশানা করে ছুঁড়লে কাজ হয়ে যায়। হলোও ঠিক তাই। গুলির শব্দ মেলাতে না মেলাতে ঝুপ ঝুপ করে দুটো শব্দ হলো জঙ্গলের ভেতরে। বুঝলাম পাখি পড়েছে। আমার ছোটভাই তাড়াতাড়ি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে পাখিদুটো তুলে আনলো।

বিক্রম অবাক হয়ে কাণ্ডটা দেখছিলো। খানিক বাদে বলে, "এই প্রথম কাউকে শব্দভেদি গুলি ছুঁড়তে দেখলাম, বুঝলে?" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "দূর, ওতো ছররা গুলি। চারপাশে ছিটিয়ে পড়ে। ওতে আর এমন কি হল!" বিক্রমের প্রশংসায় অবশ্য তাতে কোন কমতি হল না।

ওদের দুজনেরই লোভ ছিল বাঘ শিকার দেখবে। কিন্তু বাঘের বদলে মিলল তিতির। অতএব দুজনের ইচ্ছেপূরণের জন্য পরদিন ফের শিকারে বের হলাম। এবারেও তিতির নজরে এল প্রথমে। কিন্তু দেখা দিয়েই তারা জঙ্গলের গভীরে সেঁধিয়ে গিয়ে একেবারে চুপ করে বসে রইল। ঝোপের আড়ালে কতদূর পৌঁছেছে সেটা আন্দাজ করে ছররা ছুঁড়লাম বটে, তবে পাখি পড়বার কোন শব্দ মিললো না। মারোয়া দেখি হাসছে। বলে, "তুমি তো সাংঘাতিক শিকারী হে! শব্দটাও না পেয়ে শুধু আন্দাজে গুলি ছুঁড়লে। ওতে হয়?"

আমি কথা না বলে ভাইকে পাঠালাম জঙ্গলের ভেতরে একবার খুঁজে দেখতে। খানিক বাদে সে দেখি আবার দুখানা গুলিখাওয়া তিতির হাতে বের হয়ে আসছে।

পরদিন বিক্রমের রায়পুরে ফেরবার কথা। অতএব সেই দিনই সে মগরধার ক্যাম্প ছেড়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে আর সবার শেষে বাস হরে টেমারনি ফিরে গেল। সেখান থেকে রেলগাড়িতে চেপে সে চলে গেল নাগপুর। আমি গাড়ি নিয়ে হরসুদ পৌঁছে সেখান থেকে ছোটভাইকে বিকেল চারটের জব্বলপুরের গাড়ি ধরিয়ে দিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম।

ফেরার পথে গাড়িতে বালরীগ্রাম পৌঁছে ফরেস্টের ইন্সপেকশন হাট-এ চা খেতে থেমেছি তখন হঠাৎ খবর পেয়ে চাঁদগড়ের গোন্দ রাজাসাহেব এসে হাজির তাঁর সেকেন্ড হ্যান্ড মিলিটারি

জিপ নিয়ে। সঙ্গে স্থানীয় শিকারী করিম বক্স। উদ্দেশ্য আমায় নিয়ে শিকারে যাবেন। মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলমহলে তখন মিলিটারির থেকে বাতিল হওয়া এইসব জিপের জনপ্রিয়তা ছিল খুব। শিকারের জন্য এমন আদর্শ গাড়ি আর হয় না। এখনো আমাদের ভোপাল শহরে এ গাড়ির জনপ্রিয়তা কমেনি।

খানিক বাদে রাজাসাহেবের জিপে করে রওনা হলাম। জিপ চালাচ্ছিলেন রাজাসাহেব নিজেই। বালরী গ্রামে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা এক বাঙালি ভেটেরিনারি ডাক্তার আর তাঁর বাবা থাকতেন। রাজাসাহেবের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল। শিকার দেখবার লোভে তাঁরাও এসে উঠে বসেছেন জিপে।

যেতে যেতে একটা জায়গায় পৌঁছে বাঙালি ডাক্তার হঠাৎ বললেন, কাছাকাছি একটা নালার পাশে, যাতায়াতের পথে বারদুয়েক বাঘ চোখে পড়েছে তাঁর। কথাটা শুনে আমি প্রথমে ভাবলাম লোকটা বোধ হয় গল্প বানাচ্ছে। ব্যাপারটা নিয়ে আমি তাই আর বেশি হেলদোল দেখালাম না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একঝাঁক চিতল হরিণ আমাদের জিপের সামনে এসে উপস্থিত। ডাক্তারবাবু চিৎকার করছেন, "মারেন, মারেন সার!" আমি বন্দুক তুললাম না। বেরিয়েছি বাঘ মারতে। সে কাজ না সেরে হরিণের ওপর গুলি চালাবো না আমি। এই ভেবে গাড়িশুদ্ধ লোকের সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে ফের রওনা হলাম।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিলেন রাজাসাহেব। রাস্তায় বুনো শুয়োর, নীলগাই এবং চিংকারা দেখতে দেখতে আমরা এগোচ্ছি, এমন সময় ফের ডাক্তার বলে উঠলেন, "ওই যে, নালার কাছে এসে পড়েছি প্রায় সার।"

জায়গাটায় আমি আগে কখনো আসিনি। এক নজরে দেখলেই বোঝা যায়, জলের বড় কষ্ট সেখানে। সেই জন্যে আশেপাশের জঙ্গলের সব জন্তুর কাছেই নালাটা খুব দরকারি। মনে হল ডাক্তারের কথাটা মিথ্যে না-ও হতে পারে।

আমরা রাস্তার ওপরেই নালার থেকে প্রায় একশো মিটার দূরে জিপ দাঁড় করিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। সন্ধে হয়ে এল আস্তে আস্তে। অন্ধকার নামছে। হঠাৎ মনে হল, সামনে থেকে কোন একটা জীব নালার পাশ বেয়ে উঠে আসছে। সন্দেহ হতে রাজাসাহেবকে হেডলাইটের আলো ফেলতে বললাম সেদিকে। তিনি গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে আলো ফেলতে দেখি, প্রকাণ্ড এক বাঘ। রাইফেল তুলে নিশানা করে গুলি চালালাম। স্পাইনাল শট। কাঁধের ওপরে লেগে মেরুদণ্ড ভেঙে দিল তার। তৎক্ষণাৎ কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো ব্যাঘ্ররাজ। চারপাঁচ সেকেন্ড হাত পা ছোঁড়ার পর সে থেমে গেল। আমি আর রাজাসাহেব হেডলাইটের আলোয় বাঘের কাছে গিয়ে ঢিল ছুঁড়ে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে তাকে কাছ থেকে দেখছি, হঠাৎ করিম বক্স জিপ থেকে ডেকে বলে, "সার, জিপের পেছনে আর একটা বাঘ!"

আমরা বন্দুক নিয়ে জিপের কাছে ছুটে আসতে আসতেই সে বাঘটা ফের এক ছুটে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল।

রাজাসাহেব বললেন, "চলুন, জায়গাটা ছেড়ে আমরা সরে যাই। অন্য বাঘটা সম্ভবত এটার জুড়ি। আমরা সরে গেলে সে এখানে আসবেই।"

সেই মতো ফার্লংখানেক দূরে গিয়ে আমরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলাম, যদি অন্য বাঘটার কোন সাড়া মেলে।

খানিক বাদে হঠাৎ জঙ্গল কাঁপিয়ে বাঘিনীর হুংকার শুরু হল। আন্দাজ অরলাম, বাঘিনীটা সম্ভবত তার জুড়ির মৃতদেহ দেখেছে আর সেই রাগে হাঁকডাক করছে। অন্ধকার জঙ্গলে রেগে ওঠা বাঘিনীর কাছাকাছি থাকাটা খুব নিরাপদ ব্যাপার নয়। বাঘের মৃতদেহ সেইখানে ফেলেই আমরা তাড়াতাড়ি জিপে করে ফিরে চললাম। বন্দুক হাতে তিনজন অভিজ্ঞ শিকারীরও সেই সদ্য সঙ্গীহারা বাঘিনীর মুখোমুখি হবার সাহস ছিল না সে রাতে।

পরদিন খুব সকাল সকাল বেরিয়ে মৃত বাঘটাকে তুলে আনলাম আমরা। মজা দেখো, ভাই আমার কাছে এসে রইলো দু মাস, বন্ধু এলেন নাগপুর থেকে কত কষ্ট করে , অথচ হাজার চেষ্টাতেও বাঘ শিকার দেখা ঘটলো না তাদের কপালে। আর তারা রওনা হয়ে যাবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শিকারটা হয়ে গেল আমাদের। একেই বলে কপাল।

ছবিঃ মৌসুমী

নাগেরহোল জাতীয় উদ্যান

সংহিতা

স্বভাব, চরিত্রে নাগেরহোল জাতীয় উদ্যান বাণ্ডিপুরার মতোই। গাছপালা জীবজন্তু সব প্রায় একই রকম। কিন্তু পাখিরা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাগেরহোলে। তাছাড়া আছে উপজাতির বসবাস। কাবিনী নদীর বাঁধ আলাদা করেছে দুই জাতীয় উদ্যানকে।

মাইসোর আর কোডাগু জেলা জুড়ে বিছিয়ে থাকা নাগেরহোল জাতীয় উদ্যানকে, ১৯৪৭ সালের আগে, মাইসোর স্টেটের শাসনকর্তারা শিকারের খাস জঙ্গল করে রাখতেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে পর মাইসোর স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য কর্ণাটকের অধীনে এলো; তারপর রাজার খাস শিকার তালুক থেকে মুক্ত হলো নাগেরহোল; ১৯৫৫ সালে পেল অভয়ারণ্যের তকমা আর ১৯৮৮ সালে হয়ে গেল জাতীয় উদ্যান। তারপর এই জঙ্গলে ১৯৯৯ সাল নাগাদ শুরু হলো প্রজেক্ট টাইগার। এখন অপেক্ষা চলছে ইউনেসকোর বিশ্ব হেরিটেজের তকমা পাওয়ার। জাতীয় উদ্যান হিসেবে অবশ্য এই বনের নাম রাজীব গান্ধী জাতীয় উদ্যান। তবে পুরোন নাগেরহোল নামটাই এখনও বেশি চলে।

হোল মানে নদী। নাগেরহোলের মধ্যে বা চারপাশে যে নদীগুলো ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে প্রধান হলো লক্ষণতীর্থ। তাছাড়া বড়ো নদী বলতে আছে কাবিনী, সরাতি, বল্লে হাল্লা, আর নাগুর। বর্ষায় প্রায় পঞ্চাশটা নদী আর চল্লিশটার বেশি জলাশয় এই জঙ্গলে জলের যোগান দেয়। কিছু জলা জমিও আছে এখানে। এর কারণ বোধ হয় এই জঙ্গল পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত। অবশ্য উত্তরের খানিকটা অংশ পাহাড়ের ওপরই অবস্থিত। দক্ষিণে কেরালার ওয়াইনাদ আর পূবে, দক্ষিণ-পূবে রয়েছে বাণ্ডিপুর আর তামিলনাড়ুর মুদুমালাই জাতীয় উদ্যান। সব মিলিয়ে ৬৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নাগেরহোল জাতীয় উদ্যান বিছানো।

নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের অন্যান্য জঙ্গলের মতোই নাগেরহোলও ব্রিট্রিশ আমলে আসবাবের কাঠ বা টিম্বার চাষের খেত হয়ে উঠেছিল। ফলে আদত গাছপালা ধ্বংস করে প্রচুর সেগুন গাছের বাগান বানানো হয়েছিল নাগেরহোলেও। তাছাড়া দেশি গাছেদের মধ্যে প্রশ্রয় পেয়েছিল শিশু। টিম্বার যোগানদার অন্যান্য বিদেশি গাছেদের মধ্যে অন্যতম হলো সিলভার ওক। দেশি গাছগুলোর মধ্যে শাল, পিয়াশাল, আসন, গামার, হলদু, সিধা,ধ, শিমুল, জারুল ইত্যাদি প্রজাতির গাছেরা টিম্বার যোগানদার। প্রাচীনকালে ধ দিয়ে মূলতঃ রথের চাকা বানানো হতো। এরাই জঙ্গলের সবচেয়ে বেশি লম্বা গাছের দল। ডালপালা সমেত গাছের যে অংশটা ছায়া তৈরি করে তাকে গাছের ক্যানোপি বলে। সবচেয়ে উঁচু এই গাছগুলো তৈরি করে জঙ্গলের উচ্চতম ক্যানোপি। উচ্চতম ক্যানোপির যে গাছগুলো টিম্বার নয় তার মধ্যে চেনাশোনা গাছেরা হলো বট আর অশ্বত্থ। নাগেরহোলের জঙ্গলেও নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের অন্যান্য জঙ্গলের মতোই মধ্য ক্যানোপির গাছেরা শুধু টিম্বার দেয় না, দেয় সৌন্দর্যও। তার মধ্যে মুখ্য হলো অমলতাস, পলাশ, আমলকি। দেশিবিদেশি আগাছার মধ্যে রয়েছে ল্যান্টার্না, ডেসমোডিয়াম, সোলানাম, হেলিকটেরেস, ইউপেটোরিয়াম। ল্যান্টার্না যেমন বৃক্ষকুলে দুর্যোধন, কারুর জন্য জমি ছাড়ে না, যতটা পারে একলা দখল করে রাখে, তেমনই ইউপেটোরিয়াম সমস্ত গাছকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আর গাছেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টিগুণ মাটি থেকে শুষে নেয় এতো বেশি যে অন্য টিম্বারদায়ী গাছ অপুষ্ট হয়ে পড়ে।

আগাছা মানে সাধারণতঃ অপকারী গাছ-গাছড়া। অপকারী শব্দটা নিয়ে প্রচুর তর্ক আছে। যখন গাছ মানে কাষ্ঠল টিম্বারদায়ী গাছকেই বনের আসল সম্পদ মনে করা হতো, তখন ইউপেটোরিয়ামের মতো লতা, ল্যান্টার্নার মতো গুল্মকে টিম্বার বা কাঠ তৈরির পথের বাধা বলে

মনে করা হতো। এদের আগাছা বলা হতো। যখন ইকোলজির জ্ঞান বাড়ল, মানুষ প্রত্যেকটা জীবের অস্তিত্বের কারণ আলাদা আলাদা করে না বুঝলেও, এটুকু বুঝল এদের প্রত্যেকের থাকার জন্যই বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম ঠিকঠাক কাজ করে চলে। ফলে মানুষের বাণিজ্যিক প্রয়োজনের বাধা যে সব জীব তারা অপকারী, জঙ্গলের ক্ষেত্রে সে সব গাছগাছড়া অপকারী তারা সব আগাছা — এমনটা ভাবা খানিকটা হলেও বন্ধ হলো। জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্যের মতো সংরক্ষিত বনাঞ্চলে শুধু টিম্বার দেয় এমন গাছ কাটাই নয়, ইউপেটোরিয়ামের পাতা ছেঁড়াও আইনের চোখে অপরাধ। ইকোসিস্টেম আর তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে পৃথিবীর বুকে বেশি দিন টিঁকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা আর কি। সে কারণে কাকে বলে আগাছা — এ প্রশ্নের উত্তরে বনবিদরা আর বলেন না অপকারী গাছগাছড়া, বরং বলেন যে আগাছা বলে কিছু হয় না।

নাগেরহোলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাছ হলো চন্দন। চন্দন পুরো কর্ণাটক রাজ্যেই সংরক্ষিত গাছ। এ গাছ সংরক্ষিত বনের বাইরেও সরকারি অনুমতি ছাড়া কাটা যায় না। ঝড়ে বা বুড়ো হয়ে যাওয়ার কারণে মরে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া, পড়ে যাওয়া চন্দন গাছও সরকারি সম্পত্তি, তা সে যদি সাধারণ মানুষের বাগানে হয়, তাও।

নাগেরহোলের জীবজন্তুরাও বাণ্ডিপুরার জীবজন্তুর মতো। এখানেও থাকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তাছাড়া থাকে বাঘের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ উপপ্রজাতিও। প্রচুর হাতি, গাউর, ঢোল, শেয়াল, বুনো শুয়োর ছাড়াও এই জঙ্গলের জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধি এনেছে একাধিক প্রজাতির নেউল, জায়ান্ট স্কুইরেল, হরিণ। নাগেরহোলের পাখিদের জন্যও এই জাতীয় উদ্যান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে লুপ্তপ্রায় প্রজাতির শকুন, মদনটাক, বড়ো গুটিমার, বুনো পায়রা বাস করে। তাছাড়া ধনেশ, হাঁড়িচাচা, বসন্তবৌরি, টিয়া ইত্যাদি ডাঙার পাখির সাথে সাথে ইন্দ্ররাজ, মাছমরাল, সাদা দোচারা, গয়ার ইত্যাদি জলের পাখিও দেখা যায় যারা সংখ্যায় কমে আসার কারণে একেক রকম সংরক্ষণের আওতা ভুক্ত।

সবশেষে নাগেরহোলের মানুষ বাসিন্দাদের কথা। জেনু কুরুবা নামে এক উপজাতি নাগেরহোলের বাসিন্দা। এরা মূলতঃ জেনু মানে মধু সংগ্রহ করে, সেই জন্যই এদের জেনু কুরুবা বা মধু রাখাল বলে। এরা এখনও পাতা ছাওয়া কাদার ঘরে বাস করে। নানারকম শিকড়-বাকড়

খায়। মাঝে মাঝে শিকার করে জংলি জানোয়ারও খায়। তাছাড়া এরা নিজেদের বাড়ি বানানোর জন্য, আসবাবের জন্য, আর বেঁচে থাকার নানা প্রয়োজন মেটানোর জন্য জঙ্গলের ওপরে নির্ভর করে। ফলে যথেচ্ছ গাছপালাও কাটে এরা। জঙ্গলের আনাচ-কানাচ এদের কাছে হাতের তালুর মতো চেনা। ফলে নানা সুবিধে, টাকা এবং অন্যান্য জিনিসে বদলে এরা জঙ্গলের বাইরে থেকে বন্য জন্তু পাচারকারী বা টিম্বার চোরদের সাহায্য করে। এইভাবে সভ্যতার থেকে নিজেদের আড়াল করে রেখে, প্রথামাফিক বাঁচতে গিয়ে তারা বন সংরক্ষণের আইন ভাঙে। আধুনিক শিক্ষা এবং জীবনযাপণ এড়িয়ে চলে বলে জেনু কুরুবা আইনকানুন ঠিক কী জিনিস তা জানেও না, মানতেও চায় না। এদের উপজাতীয় আচার, প্রথা সংরক্ষণ করতে গেলে জঙ্গলের বাকি ইকোসিস্টেম সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে ক্রমশঃ। আবার এদেরকে জঙ্গলের বাইরে কোথাও থাকার জায়গা দিলে এদের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেয়। কারণ এরা রাগি আর নানারকমের ছোলা ছাড়া কিছুই চাষ করতে জানে না। জঙ্গলের বাইরে বেঁচে থাকতে হলে এদের খাবার, পোশাক, বাড়ি বানানোর ও তাকে বাসোপযোগী করার জন্য জরুরি জিনিস, ওষুধ ইত্যাদি কিনতে হবে। তার জন্য এদের টাকা রোজগার করতে হবে। রাগি আর ছোলা চাষ করে যে টাকা পাবে তা দিয়ে জীবনধারণ দুরূহ। অতএব আবার জঙ্গলে ফিরে গিয়ে বা যাতায়াত করে আইন ভাঙার সম্ভাবনা তৈরি হয় এদের জীবনে। গত দশকে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ইকো-ডেভলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় এদের জঙ্গলের বাইরে থাকার জায়গা আর চাষের জমি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রগতিশীল দুনিয়ার সাথে সংযোগে তাদের জীবনে তৈরি হওয়া নতুন অভাববোধ তাদের জঙ্গলেই পাঠায় আইন ভেঙে অভাব মিটিয়ে নিতে। এ এক সমাধানহীন সমস্যা।

আরেকটা সমাধানহীন সমস্যা হলো জঙ্গলের সীমায় থাকা গ্রামে হাতি বা বাঘের ঢুকে পড়ে খিদে মেটানোর উৎপাত। জন্তুরা গ্রামে চড়াও হলে, গ্রামের মানুষও চড়াও হন তাদের ওপর। অথচ গ্রীষ্মকালে নাগেরহোলের জঙ্গলে জল শুকিয়ে যায় খুব, থেকে থেকে আগুনও লাগে। তখন খিদে-তেষ্টার তাড়ায় বনের জন্তু গিয়ে পড়ে লোকালয়ে। জঙ্গলে জল জমার জায়গা, পুকুর, বাঁধ, আর মাটিতে ঘাস, বাঁশ এসব বাড়ালে এই সমস্যার থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে কিছুটা। আর আছে সংখ্যায় ভীষণ কমে আসা পাখিদের ওপর শিকারিদের হামলা। বেশির ভাগ সময়ই খাবার জন্য বা মরা বা জ্যান্ত পাখি বেচে পয়সা পাওয়ার জন্য নয়, পাখি শিকার করা হয় আনন্দ পেতে। যত শিগগির এসব জায়গায় আনন্দ দেওয়ার জন্য কেবল টিভি পৌঁছে যাবে, তত শিগগির পাখি ধরা বন্ধ হয়ে যাবে।

জঙ্গল হয় জমিতে। যেখানে জমির তুলনায় মানুষ অনেক অনেক বেশি সেখানে মানুষে আর জঙ্গলে — তার পশু, পাখি, গাছ সব কিছুর সাথে — লড়াইটা খুবই প্রকট।

ছবিঃ সংগৃহীত

পুকুরঘাটে

অচিন্ত্য সুরাল

ক। ক্ষণিকা

পুকুর ছিল আপনমনে
জলটা নিথর শান্ত
যেই পুকুরে ঢিল ছুঁড়েছি
জল হল উদভ্রান্ত
লাফিয়ে উঠে ধরলো সে ঢিল
গোলযোগের বার্তা
ছড়িয়ে দিল গোল আকারে
দেখল পুকুরপাড় তা

বার্তা গেল ঝিকমিকিয়ে
কেন্দ্র থেকে প্রান্ত
খানিক পরে যা ছিল তাই
পুকুর আবার শান্ত
পুকুর যেন ভালবাসার
একটা ছোট বিশ্ব
ঘাটের দিকে চোখ ফেরাতেই
অন্য মজার দৃশ্য।

খ। ঘাসফড়িঙের পদ্য

তির তির তির ঘাসের ডগা
কাঁপছে কীসের জন্যে
লালফড়িঙের স্পর্শ পেতে
হচ্ছে বুঝি হন্যে
ফড় ফড় ফড় লালফড়িঙের
ডানায় লাগে ঘোর
ছুঁতে গিয়েও ছুঁচ্ছেনা ঘাস
পায়না মনের জোর
কলমিলতায় ব্যাঙের ছানা
শাপলা জলে ভাসে
ফড়িং ঘাসের কাণ্ড দেখে
খিলখিলিয়ে হাসে
লজ্জা পেয়ে ফড়িং গেল
ফুরুৎ করে উড়ে
লালের আভা রইল ফুটে
ঘাসের শরীর জুড়ে

ছবি-- সংগৃহীত

বুড়ির কারবার

সংহিতা

খোলামকুচি আমড়াগাছি বাজে কথার ঝুড়ি
বেচত হাটে সকাল সকাল থুত্থুড়ে এক বুড়ি
টেকনোলজি ভেলকিবাজি কাজ করে দেয় সোজা
বুড়ি কেবল পিং করে যায় বুনতে বুনতে মোজা
দেখ বাবাজি রঙীন মোজা বুড়ির সাইট জুড়ে
ডেলিভারি ফ্রিতে দেবে গিফ্‌ট র‍্যাপারে মুড়ে
ডেলিভারি ঝক্কি ভারি শতেক লোকের মেলা
বুড়ি ভীষণ ব্যস্ত থাকে, সামলাবে কে ঠেলা?
ডেলিভারি সামাল দিতে রাখল ভাড়ার আপিস
সময় পেয়ে খুঁজছে বুড়ি যন্ত্র নকলনবিশ
উচিৎ মতো যন্ত্রখানা যক্ষুণি সে পাবে
তক্ষুণি তার নকশাখানা সাইটে তুলে দেবে
সেই নকশা কিনবে সবাই বুড়ির ই-মার্টে
যন্ত্রখানা বানিয়ে নেবে নিজেই স্ক্রুপ এঁটে
তারপর তো হাটবাজারে বেচবে না কেউ কিচ্ছু
ঘরে বসে বানিয়ে নেবে বাঁদর বেজি বিচ্ছু
মালমশলা বদলে দিয়ে যন্ত্রে করে খাটখুট
যখন তখন বানিয়ে নেবে মোজা মুড়ি বিস্কুট

ছবিঃ অমৃতা

চাঁদ-নামচা

জামাল ভড়

চাঁদে একটা বুড়ি আছে যে বুড়িটা মরে না ;
সেই বুড়িটা চরকা কাটে রাতের বেলায় ঘুমায় না ।

বুড়ির মামা সবার জানা তোমার মামা আমার মামা
সেই মামাটার নামটি শুনে ছিচকাঁদুনির কান্না থামা ।

মায়ের কোলে চাঁদের শিশু চাঁদকে বুঝি হার মানায়
তাইতো চাঁদ নিজেই এসে চুপিসারে টিপ পরায় ।

ছবি-সংগৃহীত

গল্প নয়কো অল্প

হীরক সেন

এক রাজা এক রানি,
বহু দিনকার এক কাহিনী
সবাই শোনে, সবাই জানে -
তবু অচেনা গল্প খানি।
রাজার কুমার, পংখিরাজ,
নিরুদ্দেশে যাত্রা আজ
সাত সমুদ্র, তেরো নদী,
দত্যি দানো যুদ্ধ সাজ।
রাজকন্যা অচিনপুর-
পাতালপুরী কোন সুদূর,

সোনা রূপার দুই কাঠি-
ঘুম ভাঙানি গানের সুর।
প্রাণ ভোমরা, দীঘির তল
একদমে ডুব অথৈ জল,
রাক্ষসেরা ঠাণ্ডা আজ।
নটেগাছ কে মুড়ালি বল?
এক রাজা এক রানি,
চির সবুজ এক কাহিনী
সবাই শোনে, সবাই জানে -
তবু আবার বলনা, শুনি ....

ছবি-সংগৃহীত

দাড়ি

অমিতাভ প্রামাণিক

দাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি মোটে নয় কাম্য —
দাড়িতে হারিয়ে যায় মানসিক সাম্য!
রোগা দাড়ি, বাঁকা দাড়ি, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে
কাড়াকাড়ি হ'লে, স্থিতি চলে যায় বাড়িতে।
কারো দাড়ি বিচ্ছিরি, কারোটা বা ভেলভেট
কেউ দেয় সুড়সুড়ি, কেউ সাঁটে নেমপ্লেট!
দাড়িতে ছড়িয়ে বীজ ফলায় দাড়িম্ব!
মুরগি দাড়িতে ঢুকে তা দিচ্ছে ডিম্ব!
পণ্ডিত লোকেরাও বানায় ছাগলদাড়ি —
লাগায় বিজ্ঞাপণ, ম্যা' খিলাড়ি তু আনাড়ি!
দারা সিং বলেছিলো, "দাড়ি বড়া মৎ কর।
দাড়িতে সিজন চেঞ্জ — বৈশাখে পতঝর!"

ফুটবলে গোলকি'টা দাড়ি যদি না ছাঁটে —
পারবে কি বডি ফেলে হ্যাটট্রিক বাঁচাতে?
দাড়ি নিয়ে হিমশিম ক্রিকেটের ফিল্ডার,
ফুচকার ফেরিওলা, সব বডিবিল্ডার!
গরমেতে চুল নিয়ে চুলোচুলি দিনরাত —
দাড়াদাড়ি শুরু হ'লে খাবে কি পান্তাভাত?
দাড়ির জঙ্গলেতে কালো কালো উকুনেরা
টেররিস্ট হয়ে পড়ে বানিয়ে মস্ত ডেরা!
তাই বলি এইবেলা ভালো যদি চান তো
মেনে নিন 'দাড়ি ভালো' ধারণাটা ভ্রান্ত!
'পামোলিভ লা-জবাব' বলেছে কপিলদেব।
চলে যান সেলুনেতে করে নিন ক্লিন শেভ!

ছবিঃ সংগৃহীত

দূরদর্শী

জ্যোতির্ময় দালাল

(গুণ্ডা :) দুচোখ দিয়ে ঠাওর করে
দ্যাখ চেয়ে এই চাক্কুখান!
তারপরে বল্ খাটিয়ে মাথা
ব্যাগ দিবি, না দিবি জান ?
(বাবু :) ব্যাগটা দিলেও টাকার শোকে
ধড়ফড়িয়ে পরাণ যাবে
তার চে' বরং জানই কবুল
টাকাটা তো রক্ষা পাবে !

ছবিঃ সংগৃহীত

কবি আদিত্য মাণ্ডির গল্প

উমা ভট্টাচার্য

কেন্দ্রীয় সরকারের আধা সামরিক বাহিনীর এক জওয়ানের গল্প বলি শোন, যে তার সাহিত্য কর্মের জন্য ২০১১সালে "সাহিত্য অ্যাকাডেমি" পুরষ্কার পেয়েছে। সি আই এস এফ এর এই জওয়ানের নাম আদিত্য মাণ্ডি। সাঁওতালী ভাষায় মর্মস্পর্শী, সমাজসচেতন ,কবিতার বইয়ের জন্য এই সম্মান পেয়েছে সে।

২০১২র মার্চ মাসের দশ তারিখের টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় পি টি আইয়ের একটা রিপোর্টে আমার নজর আটকে গেল-

"সি আই এস এফ এর জওয়ানের তার বাবার উদ্দেশ্যে রচিত কবিতা সাহিত্য একাডেমি পুরষ্কার পেয়েছে। সি আই এস এফ তাদের বাহিনীর ৪৩ তম বাৎসরিক উৎসবের অনুষ্ঠানে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরষ্কার বিজয়ী জওয়ান আদিত্য মাণ্ডিকে নিজেরাও পুরষ্কারে সম্মানিত করেছে। পুলিশের লেখা কবিতা অ্যাকাডেমি সম্মান পেল , কাজেই কে এই আদিত্য মাণ্ডি জানতে কৌতূহল হল। খোঁজখবর নিয়ে যা জেনেছি সেই কথা তোমাদেরও জানাই।

বাঁকুড়া জেলার সেরেঙ্গার বুরুঘুতু গ্রামে ১৯৭৪ সালের ১৯ শে জানুয়ারি তারিখে এক গরিব সাঁওতাল চাষি পরিবারে তার জন্ম। বাবা মা ও ছেলের অভাব থাকলেও আনন্দের ছোট্ট সংসার। বাবা ছিলেন খুবই উদ্যমী মানুষ। তিনি চাইলেন একটু ভালোভাবে বাঁচার জন্য, আয় বাড়াবার জন্য চাষের জমি একটু বাড়াতে। একটু একটু করে জমানো টাকায় অন্য এক চাষির কাছ থেকে ২ বিঘা জমি কিনলেন তিনি। তখন আদিত্য নেহাতই ৭/৮ বছরের ছেলে।

আমাদের চারপাশের শহরের মানুষের মধ্যে তোমরা দেখবে অনেক অন্ধবিশ্বাস আছে। কেউ জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে ভাগ্য ফেরাবার জন্য হীরেমুক্তো কিনে পরে, কেউ পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবার জন্য পড়াশোনা করবার বদলে ঠাকুরের কাছে মানত করে রোজরোজ। আরো একটা মজার ব্যাপার হলো, শহরের রীতিনীতির বাইরে যদি কেউ কোন কাজ করে তাহলে তার ভারি নিন্দে হয়।শাস্তিও হয়। ধরো তুমি ক্লাস টেস্টের দিনে ধুতি পরে ইশকুলে গেলে, কিংবা ঘরে গরম লাগছে বলে ভাতের থালা হাতে পার্কের মধ্যে চলে গেলে রাতের খাবার খেতে। এখন, এই কাজগুলো তো কোন ভয়ানক বেআইনি কিছু নয়। কিন্তু তুমি যদি এমন করো তাহলে

তোমার কী হবে ভাবো তো! ঘরে শাস্তি, ইশকুলে শাস্তি, বাবা মা ডাক্তার ডাকতে ছুটবে, কিংবা গুরুদেবের বাড়িতে গিয়ে মানত করে বসবে।

অন্ধবিশ্বাস, আর এলাকার রীতিনীতির থেকে বাইরে গেলে শাস্তি দেবার প্রথা শহরের মতোই শহর থেকে অনেক দূরে, জঙ্গলের ভিতর দিকে থাকা আদিবাসী মানুষের মধ্যেও আছে। সে সব অন্ধবিশ্বাস সব সময় মঙ্গলময় নয়। তাদেরও সমাজের রীতিনীতি ,বিশ্বাস, প্রথার বাইরে কেউ গেলেই সমাজের রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়াতে হয়, জবাবদিহি করতে হয়, তাদের বিধান মাথা পেতে নিতে হয়। অবাধ্য হলে বিষম শাস্তি দেয়া হয় । জমি কেনবার পর আদিত্যর বাবার ওপরেও এমনই বিচারের খাঁড়া নেমে এল। তাদের সমাজের রীতি ছিল, নিজের উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া সম্পত্তিটুকুই ভোগদখল করতে পারবে কেউ, অন্য কারোর কাছ থেকে জমিজমা কিনতে পারবেনা। আদিত্যর বাবা নিজের পৈতৃক জমি থাকতেও আন্যের কাছ থেকে জমি কিনেছিলেন কেন,এই অপরাধে মাতব্বরেরা তাঁকে একঘরে করবার বিধান দিলেন। তাদের পরিবারের সঙ্গে কেউ মিশতো না ,কথা বলত না, তাদের বাড়িতে আসতো না, তাদের কেউ নিমন্ত্রণ করতো না, এমনকি খাবার জলটুকুও তাদের গ্রামের কুয়ো থেকে নিতে দেওয়া হতনা। আদিত্য দেখেছে তার মাকে কষ্ট করে নদী থেকে গিয়ে জল আনতে।

এ সবই ছোট্ট আদিত্য নিজের সামনে ঘটতে দেখেছে ।কষ্টও পেয়েছে। তার কোনও খেলার সাথীও ছিলনা গ্রামে,কেননা কেউ তাদের ছেলেদের আদিত্যর সঙ্গে খেলতে দিতনা । স্কুলে যাওয়াও মানা ছিল তার।

এত অত্যাচার সহ্য করেও কোনমতে তাদের দিন চলছিলো। কিন্তু গ্রামের মোড়লরা এরপর তার বাবাকে চুড়ান্ত শাস্তি দেবার জন্য তাকে 'ডাইন' (খারাপ বা কালো জাদুর জাদুকর) ঘোষণা করলো । এতদিন সমাজের তুচ্ছতাচ্ছিল্য অপমান সহ্য করেও বাবা গ্রামেই ছিলেন, কিন্তু ডাইন অপবাদ সইতে পারলেন না আদিত্যর বাবা। একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন তিনি।১২ বছরের আদিত্যর জীবন থেকে তার বাবা হারিয়ে গেলো। তারা অনাথ,অবলম্বনহীন হয়ে গেলো।

সে অবশ্য একদিকে ভালই হল, না হলে আদিবাসী সমাজের নিয়মে হয়তো ডাইনকে পুড়িয়েই মারা হতো। বাবা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় আদিত্যকে আর সেই কষ্টটা সহ্য করতে হয়নি। তাই আজও সে আশা করতে পারছে তার বাবা একদিন হয়তো ফিরে আসবেন। এই আশা নিয়েই সে তার কবিতাগুলি বাবার উদ্দেশ্যে লিখছে। তাতে সে লিখছে সমাজের এইসব খারাপ প্রথার কথা। তার থেকে মানুষকে বেরিয়ে আসার ডাক দিয়েছে তার কবিতাগুলো।

দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে বড় হতে হতে তার দুঃখিনী মায়ের কষ্টের ছবি ,তার বাবার স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত।এই তাড়নাই অবশেষে তাকে, বড় হবার শক্তি জোগাল। নিজের চেষ্টায় একটু একটু করে লেখাপড়া শিখতে লাগলো সে। মাতৃভাষা সাঁওতালীর পাশাপাশি শিখতে লাগলো বাংলা,হিন্দি,ও ইংরাজী ভাষা ।

১৯৯২ সালে কেন্দ্রিয় শিল্প নিরাপত্তা বল(সি আই এস এফ)-এর জওয়ানের চাকরি পেল আদিত্য।কাজে যোগ দিল মুর্শিদাবাদের ফারাক্কার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। এইখানেই কাজের পাশাপাশি শুরু হল তার লেখার কাজ, তার সাধনা। বুকের ভেতর জমে থাকা এত দিনের বেদনার কথা ,তার ডাইন অপবাদ নিয়ে হারিয়ে যাওয়া বাবার কথা , আদিবাসী সমাজের নানান সমস্যার কথা বের হয়ে আসতে লাগলো মাতৃভাষা সাঁওতালিতে লেখা অজস্র কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে। এর মধ্যে অনেক মর্মস্পর্শী লেখাই তার হারিয়ে যাওয়া বাবাকে উদ্দেশ্য করে।

একটি কথা সে লেখাতেও বারবার বলেছে আর অ্যাকাডেমি পুরষ্কারের সম্বর্ধনা সভাতেও বলেছে। সেটা এইরকম, “অন্ধবিশ্বাসী মানুষেরা সমাজের অন্যদের প্রতি যে অন্যায় অবিচার করে, নির্দোষ মানুষকে ডাইনি অপবাদ দিতে, ইচ্ছেমত পুড়িয়ে মারতেও দ্বিধা করেনা ,তাদের দেশের সরকার কোনদিন ক্ষমা করে দিলেও আমার ‘কলম’ কোনদিন তাদের ক্ষমা করবেনা” ।

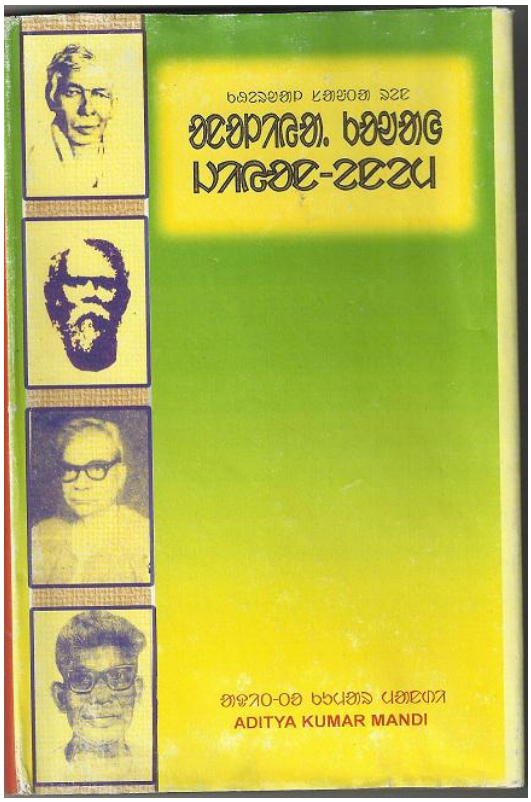

তার লেখা চলছে ১৯৯৬ সাল থেকেই। প্রায় প্রতি বছরই একটি করে বই প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তবে সাঁওতালী ভাষায় লেখা হবার ফলে তার নিজের ভাষার মানুষরা লেখাগুলো পড়তে পারলেও শহরের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরা এখনো তার বই পড়তে পারছে না।

যে কবিতার বইটি তাকে এই পুরস্কার এনে দিয়েছে তার নাম হল “বাঞ্চাও লারহাই” মানে “বাঁচার লড়াই” (স্ট্রাগল অফ লাইফ)। ২০০৮ সালে বইটির প্রকাশ হয়। এই বইটির কবিতাগুলিতে প্রধানত সাঁওতাল আদিবাসীদের আর্থসামাজিক জীবনের অবস্থার বর্ণনা আছে। যে সব আদিবাসীরা প্রধানত বিহার ,ঝাড়খণ্ড,উড়িষ্যা,মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা তাদের সমাজজীবনের কথা ,তাদের প্রয়োজনের কথা,শিক্ষার অভাবের কথা কবিতার ছত্রে ছত্রে তুলে ধরেছে আদিত্য। সকলের কাছে আবেদন রেখেছে এই অসহায় মানুষগুলোকে

সাহায্য করতে আর আদিবাসী সমাজের কাছেও আবেদন রেখেছে কুসংস্কারমুক্ত সুন্দর জীবন গড়বার জন্য এগিয়ে আসতে।

১৯০ পাতার বাঞ্চাও লারহাই বইটিতে ১১৪ টি কবিতা আছে। প্রতিটি কবিতাই মর্মস্পর্শী,এক সার্বজনিক আবেদন সম্পন্ন। পুরষ্কার কমিটির জুরিরা বিষয়বস্তু বর্ণনার নিরিখে ভারতীয় কবিতার জগতে সাঁওতালী ভাষায় লেখা এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বলে অবিহিত করেছেন।

দিল্লিতে পুরষ্কার নেবার সময় সে তার খাকি পোশাকেই মঞ্চে উঠেছে। সভায় সে বলেছে তার বাবার সেই অপমানক্লিষ্ট অবস্থার কথা । সে বলেছে বাবা নিশ্চয়ই কোথাও আছেন ,হয়তো তিনি তার ছেলের এই সম্মানের কথা শুনে আবার মাথা উঁচু করে ফিরে আসবেন,এই তার আশা। সে বলেছে "এই পুরষ্কার কোথাও না কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়া বাবার জন্য যে প্রতীক্ষা , যে অন্বেষণ, তাকেই সমর্থন জানালো। হতে পারে তিনি যখন জানবেন আমি এই সাহিত্যসম্মান পেয়েছি তখন তিনি মাথা উঁচু করে ফিরে আসবেন"।

তার লেখা সিলি, চিঠি, লাহান্তি,পচ্চিম বাংলা প্রমুখ ৯টি বিভিন্ন জার্নাল ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে,। ২০০০ সালে সে "এ আই এস ডবলু এ"সংস্থা থেকে "পোয়েট অফ দি ইয়ার"সম্মান, ২০১০ সালে "বিরসা মুণ্ডা অ্যাওয়ার্ড", "রামদাস টুডু অ্যাওয়ার্ড" ২০১১ তে ভারতীয় ভাষা পরিষদ থেকে "যুবা" পুরষ্কার পেয়েছে। সব অনুষ্ঠানেই তার বক্তব্যে আদিবাসী জনজীবনের কথার সঙ্গে তার বাবার কথা, তার বাবার ফিরে আসার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। এই পুরষ্কার পাওয়ার পর নিজের ডিপার্টমেন্টও তাকে সম্মানিত করেছে আর কথা দিয়েছে "ফরাক্কার এই চারণ কবি"র লেখার কাজে যেন কোনও বাধা না পড়ে তা তাঁরা দেখবেন।

এমন ছেলে কটা হয় বলো তো দেখি! আমরা নিশ্চয় জানি, এমন ছেলের বাবা কখনো চিরকাল হারিয়ে গিয়ে থাকতে পারেনই না! এইবারে একদিন তিনি নিশ্চয় ফিরে আসবেন আদিত্যর কাছে। জয়ঢাক আদিত্যর জন্য সেই শুভকামনা জানায়।

ছবিঃ সংগৃহীত

ধাঁধা

১। লালবর্ণ, হিলহিলে
নেড়েচেড়ে গিলে খান
লালবর্ণ, হিলহিলে
নেড়েচেড়ে গাহেন গান

২। আছে তার,
বাক্য বলে চমৎকার
নাই তার,
বাক্য বলে চমৎকার।
সুজন গেলে দূর
শোনায় তাহার সুর

৩। কাঠের সিঁড়িতে
পায়ের আওয়াজ
ভাঙা দরজায় হাওয়া
কাঁচি হাতে ধরে
ঘন কেশদাম
মহাসুখে কেটে যাওয়া

৪।বেশি নয়
পাখির ডাক
ইংরিজি আলকাতরা
সঙ্গে নিয়ে
টেলি পথে
জ্ঞানসমুদ্র সাঁতরা

কুইজ

১। ভারতের দীর্ঘতম নদী কোনটা?

২। এদের মধ্যে কোনটা ভারতে নয়? মানস সরোবর, ডাল, উলার, কেম্পটি

৩। শোন নদীর উৎস কোথায়?

৪। নর্মদা নদীর উৎস কোথায়?

৫।মেধা পাটকরের সঙ্গে ভারতের কোন নদীর নাম সবচেয়ে বেশি জড়িত?

৬।কোন নদী উপত্যকার উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে বিন্ধ্য সাতপুরা পাহাড়?

৭। ধানসিরি কীসের নাম?

৮। ভারতের ইংরিজি নামটা কোন নদীর থেকে এসেছে?

৯।ঠাকুরাণী নদীটা কোন এলাকায়?

১০। করলা নদী বাংলার কোন এলাকায়?

জানো কি?

১। এরোপ্লেন বা জাহাজ বিপদে পড়লে বেতারে যে সংকেত দেয় সেটা হলো “মে ডে” , “মে ডে।” ফরাসি ভাষায় m’aidez মানে হলো আমায় সাহায্য করো। সেই থেকে এই শব্দটা এসেছে।

২। পুরোন দিনে ইউরোপের বহু জায়গায় পিগ নামের একধরণের গাঢ় বাদামি মাটি দিয়ে টেঁকসই পাত্র টাত্র বানানো হত। ওই দিয়ে তৈরি পয়সা জমানোর ভাঁড় কে বলা হত পিগ ব্যাংক। সেই থেকে পিগি ব্যাংক শব্দটার জন্ম।

৩। মানুষ প্রতি বছর কফির পেছনে আশি বিলিয়ন ডলার খরচ করে।

৪। পঞ্চদশ শতক নাগাদ ভেনিসের ফ্যাশনেবল মেয়েরা যে কাঠ ও কর্ক

দিয়ে তৈরি চপিন নামের প্ল্যাটফর্ম জুতো ব্যবহার শুরু করেন, সেই হল আধুনিক হাই হিল জুতোর পূর্বসূরী। তবে সঙ্গের ছবিটা দেখলেই আশা করি বুঝতে পারবে, জুতোটা পরে ঘুরে বেড়ানো সহজ ছিলোনা। চপিন পরে পথ চলার সময় ফ্যাশনেবল মহিলারা

তাই সঙ্গে লোক রাখতেন, ব্যালেন্স রাখবার জন্য আর পড়ে গেলে ধরে তুলবার জন্য।সবচেয়ে উঁচু যে চপিন হত তা ছিল ২০ ইঞ্চি উঁচু!

কীসের ফটো

ড্রুডল

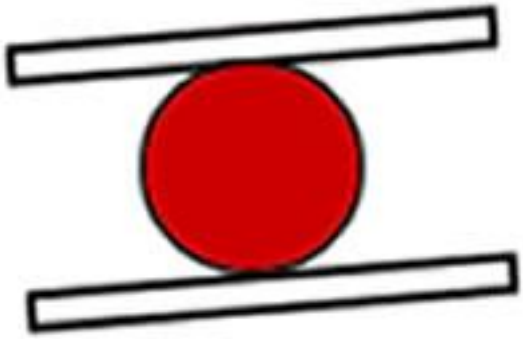

অবিশ্বাস্য

ফ্রান্সের অ্যাগুলা দু মিদি পর্বতের ১২৫০০ ফিট উঁচুতে অবস্থিত এই ব্রিজটা দেখো। মেঘের মধ্যে দিয়ে তার পথ।

মজার ইন্টারনেটঃ

ইউনেস্কো ইন্ট্যাঞ্জিবল হেরিটেজঃ

পূর্ব ক্রোয়াশিয়ার ‘বেকারাক’ সঙ্গীত থেকে শুরু করে লাদাখের বুদ্ধমন্ত্রগান, চিচিবুদের হেমন্ত উৎসব থেকে চিনা ছায়াপুতুলের নাচ, বিশ্বের এমন সব আশ্চর্য সব অনুষ্ঠানকে একত্র করে তৈরি হয়েছে ইউনেস্কোর ২০১১-র বিশ্বসংস্কৃতির নির্বাচিত তালিকা।

দেখতে পাবে এই ঠিকানায়ঃ

http://www.unesco.org/archives/multimedia/index.php?id_page=34&pattern=2011+inscriptions+on+the+Representative+List

ভয়াল জীবের দুনিয়ায়

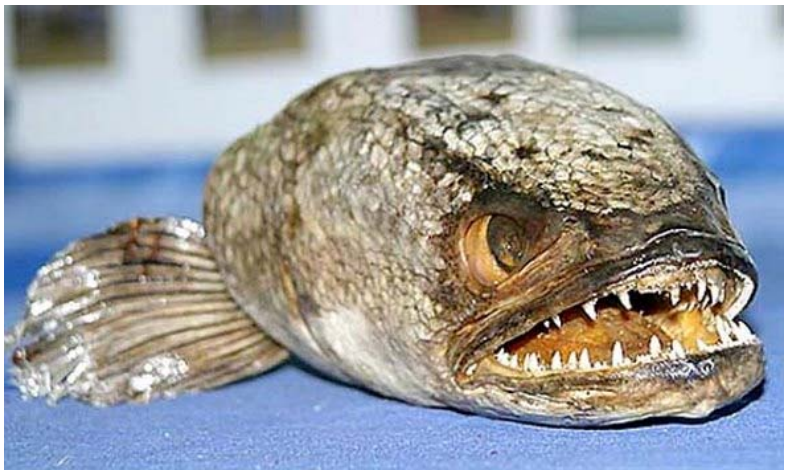

হিংস্র ঘাতক গাছ- তারা নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে বিষ তৈরি করে প্রাণীদের মারে। জলতলের দানব , গডজিলার ভায়রাভাই ফিশজিলা, এমন আরো কতো ভয়াল জীব আছে পৃথিবীতে। তাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারো এই ঠিকানায়ঃ

http://www.weirdworm.com/5-incredible-animals-and-plants/

হল্ট লেস শরক

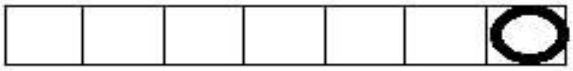

বামশ্যাডি পোজার

এপ্রিলের কটা জার নটা

নিফটি টিম এমর

আমা হস্ত নুন

এইবারে ওপরের গোল্লা দেয়া অক্ষরগুলো দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দাও- মধুমোড়া, আঙুলে পেনসিল, গাঁট্টা, রামচিমটি এসব কী বস্তু?

গত সংখ্যার উত্তর

ধাঁধাঃ ১। জানালার বাইরের দিকে ভেপার জমে না। ২।রাস্তার পাশে ছেলেটার শোবার ঘরে। খেলনা ঘোড়ায় চড়ছিলো। ৩। ৮৮৮+৮৮+৮+৮+৮ ৪। মানচিত্র

কুইজঃ চল্লিশ হাজার। তিন কোটি বছর। আটচল্লিশটা। পেট। চিনেবাদাম। চার জোড়া। মাকড়শা

ড্রুডল: পাহাড়ি নদীতে নৌকা রেস।

হযবরল: কর্ণকুন্তিসংবাদ,মেঘনাদবধ কাব্য , দশকুমারচরিত , কথাসরিতসাগর

ধাঁধার উত্তরঃ কাক, বাঘ, কুকুর

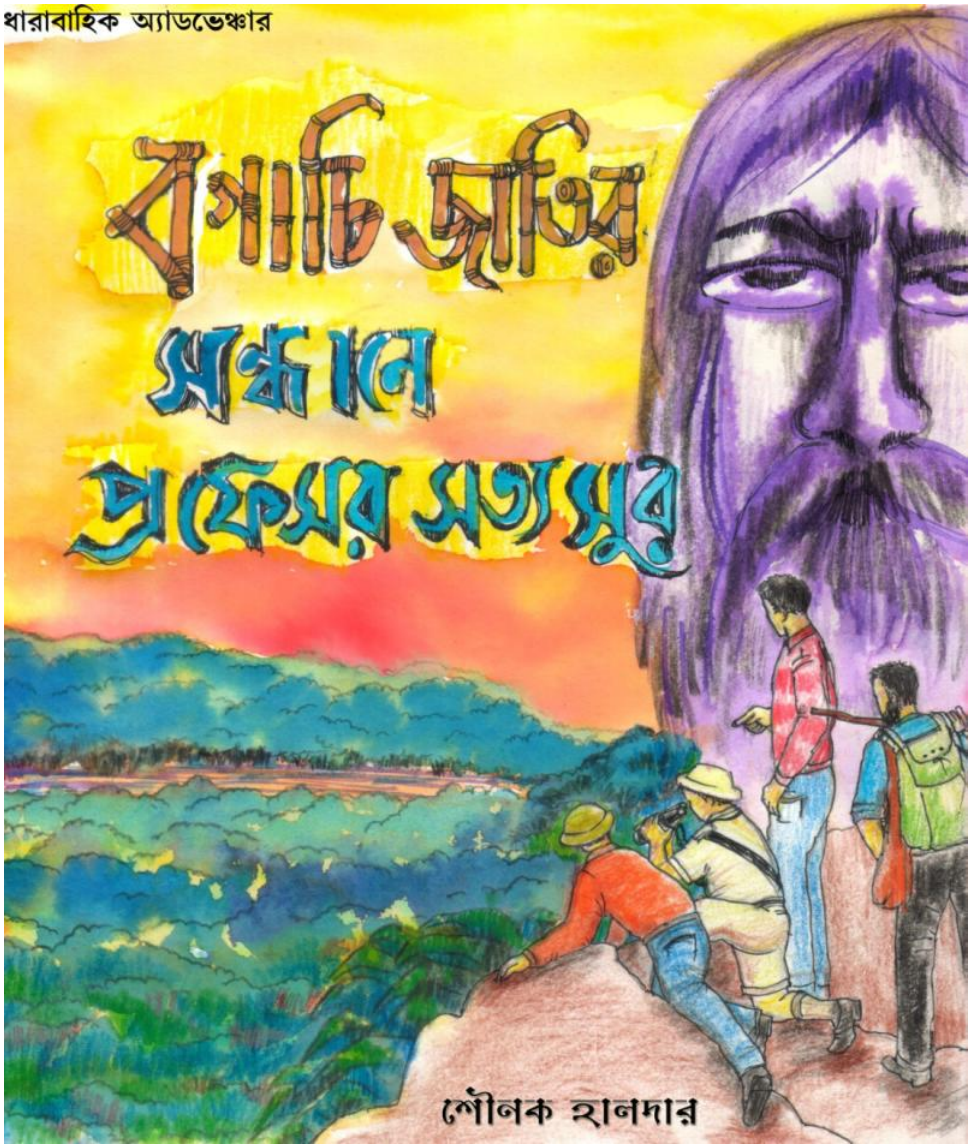

আগে যা ঘটেছেঃ

ইহুদিদের এক হারিয়ে যাওয়া শাখার খোঁজে মিজোরামের বনপাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে অভিযাত্রী ক্লাবের সদস্যরা অবশেষে এসেছে নীলপর্বতের গায়ে। সেখান থেকে উল্টোদিকের ঢালে আবিষ্কার করা গেল আচাইদের গল্পে শোনা সেই হ্রদকে যার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল নীলপাহাড়ের অজানা মানুষেরা। সেখানে পৌঁছে অদৃশ্য আক্রমণকারীদের হামলা শুরু হল তাদের ওপর-

তারপর--

আমার কেমন যেন লাগল। মনে হল আর বোধহয় বাড়ি ফিরে যেতে পারবো না। আমরা একটা ভয়ানক অশুভ কিছুর একদম কাছে এসে পড়েছি---আমাদের সংঘর্ষ অনিবার্য!

আমার আতংকই আমাকে ব্যাগ থেকে ভীমরাজ পাখির পালকটা বের করতে সাহায্য করল। জিমাই পুরোহিতের কথা মনে পড়ে গেল,''বিপদে পড়লে, একে হাওয়ায় উড়িয়ে দিও---''আমি কি মনে করে ব্যাগ থেকে পালকটা বের করে পকেটে ভরলাম।

রাতটা জাগতেই হবে। চঞ্চলদা অস্থির হয়ে পায়চারি করছে। সত্যদা বসে বসে শূন্যে ঘুঁষি ছুঁড়ছে।আর অতনু একটা লোহার ডান্ডা হাতে নিয়ে নির্বিকার মুখে বসে আছে।

বোধহয় নার্ভের উপর দিয়ে বেশি অত্যাচার হয়ে গেছিল। আমি ব্যাগে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। একটু পরেই দুচোখ বুঁজে এল। তারপর আর মনে নেই।

তৃতীয় দিন

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল চোখের ওপর তাঁবুর ফাঁক দিয়ে সূর্যের রশ্মি এসে পড়াতে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বাইরে সকাল। তাঁবুর ভেতরটাও আলোকিত। কিন্তু বাকিরা সব গেল কোথায়? জিনিষপত্র সব আছে,মানুষরা নেই। আমি বসেবসেই সবার নাম ধরে চীৎকার করে ডাকলাম। উঠে খুঁজবার সাহস হল না। ফের চীৎকার করলাম। কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না।

আমার সারা শরীর আতংকে হিম হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম আমি একদম একা। সেই মায়াবিরা এসে ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে চলে গেছে;আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়ে গেছে। এখন এই অলৌকিক অশুভ জায়গায় আমি একদম একা। কেউ আমাকে কোনোদিন খুঁজতে আসবে না,কেউ উদ্ধার করবে না। আজকের দিনটা কিভাবে কাটাবো? আর রাতটা? না,আজ রাতে আমার নিস্তার নেই। আজ রাতেই আমার শেষ। কি নৃশংসরূপ মৃত্যু আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, এই ভাবনাতেই আমার অনেকক্ষণ কেটে গেল।

আলো আরো প্রখর হল। আস্তেআস্তে আমার সুস্হ চেতনা ফিরে এল। ছি:,এ কী ভাবছি আমি? আমার সঙ্গীরা কোথায় আছে---তাদের না খুঁজে আমি পালাবার কথা ভাবছি? মনে ভীষণ সাহস এনে তাঁবু থেকে বেরোলাম। মাথার ওপর নীল আকাশ। একদিক থেকে পাহাড় উঠেছে। আরেক দিকে গভীর জঙ্গল। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেই সব রহস্যময় হ্রদ। অথচ তার স্হির নীল জল দেখে এখন যেন চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। কি অপূর্ব দৃশ্য চারদিকে! সবুজের খ্য়েরির কত শেডে ঢাকা জঙ্গল। থোকা থোকা ফুল আর অর্কিডে ছেয়ে গেছে চতুর্দিকে। একি স্বর্গ নাকি ভ্রম?

পকেট থেকে ভীমরাজ পাখির পালকটা বের করে উড়িয়ে দিলাম। মনে মনে বললাম,''যদি তোমার মহিমা কিছু থাকে, তবে আমাদের সাহায্য করো। বিশ্বাস করো, আমরা কোনো লোভ নিয়ে এখানে পা দিইনি--''

পালকটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। পাথরের চত্বরটার উপর দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকলাম---সত্যদা,চঞ্চলদা,অতনু----

কোনো সাড়া নেই। আমার বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠল। আমার সঙ্গীরা কোথায় হারিয়ে গেল? ভাবছি কী করি এখন? এই গভীর জঙ্গলে নেমে খুঁজে দেখব,নাকি ফিরে যাবো? পরে দানিকেনকে নিয়ে এসে খুঁজবো? এইসব ভাবছি---হঠাৎ মাথার ওপর দিয়ে কি একটা দ্রুত চক্কর দিয়ে গেল। একটা ভীমরাজ পাখি!সূর্যের আলোয় তার লম্বা লেজটা ঝকঝক করছে!

কি যেন ডাক দিয়ে আবার মাথার ওপর চক্কর কাটল। পরিষ্কাব শুনলাম সরু গলায় ডেকে চলেছে একটানা---সত্যদা,চঞ্চলদা,অতনু---

ভীমরাজ পাখি ডাক নকল করতে ওস্তাদ, চট করে মনে পড়ে গেল। পাখিটা চক্কর মেরে নীচের দিকে নেমে গেল। আবার এল,আবার ডেকে উঠল---সত্যদা,চঞ্চলদা,অতনু---

ফের জঙ্গলে নেমে যেতে আমি কি মনে করে ওর পিছু নিলাম। তলায় গা ছমছমে গভীর জঙ্গল। ফুলে আর অর্কিডে ভরা। ঐ পাখিটা ছাড়া আর কোনো জীবিত প্রাণী নেই। মোহাবিষ্টের মতন ওর পিছুপিছু এগিয়ে গেলাম। পাখিটা সেই একইভাবে চক্কর কেটে এগোচ্ছে আর একটানা এগোচ্ছে আর একটানা ডেকেই চলেছে।

কতক্ষণ এভাবে হাঁটছিলাম কে জানে,চারপাশের সৌন্দর্য আমাকে অবশ করে দিচ্ছিল ক্রমশ:--হঠাৎ হ্রদের কাছে আসতে দেখলাম,কিনারায় তিনটে দেহ পড়ে আছে। দৌড়ে গিয়ে

দেখি,আমার তিন সঙ্গী চিৎ হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে---যেন মৃতদেহ।

কাছে গিয়ে তিনজনের বুকের কাছে একে একে কান দিলাম। হ্যাঁ,হৃদপিণ্ডেব স্বাভাবিক আওয়াজ আসছে---তবে বেশ মৃদু। হায় হায়---আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল!

ভীমরাজ পাখিটা আর ডাকছে না--শুধু চক্কর মারছে। হ্রদ থেকে জল এনে আঁজলাআঁজলা করে দিলাম এক এক জনের মুখে চোখে---কারুরই জ্ঞান ফিরল না। ভীষণ হতাশ লাগল। খুব জলতেষ্টা পাচ্ছিল। হ্রদ থেকে নিয়ে জল খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা হল। যখন

জল খাচ্ছিলাম,তখন স্পষ্ট দেখলাম হ্রদের তলায় শুধু এলোমেলো পাথরের স্তূপ---তালগোল পাকানো--আর কিছু নেই!!!

ভীমরাজপাখিটা চক্কর কেটেকেটে তাঁবুর দিকে ফিরে যাচ্ছে। আমি আর বেশি মাথা না ঘামিয়ে সোজা সত্যদাকে কাঁধে তুলে তাঁবুর দিকে রওনা হলাম। তিনটে মানুষকে তাঁবুর উপরের পাথরের চত্বরে আনতে আনতে বেলা গড়িয়ে এল। পাখিটা তখনও আশপাশে থাকছে। ঠিক করলাম যে পাথরের খাঁজ পেরিয়ে এপারে এসেছি, সেটা দিয়েই এদের নিয়ে যাবো ওধারে। তারপর দেখা যাক কী করি! সূর্য ডোবার পরে আর এদিকে নয়।

শেষবারের মতন তাঁবু থেকে দু একটা দরকারি জিনিস ব্যাগে ভরে নিয়ে বেরোলাম। বাকি সব কিছু পড়ে রইল। শেষবারের মতন হ্রদের দিকে তাকালাম। হ্রদের জল ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে---সূর্য ডুবছে---ফিরে আসছে মায়ার জগত!

ভীমরাজপাখি তার শেষ চক্কর মেরে উড়ে গেল-কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি দু-হাত জোড় করে মাথা নোয়ালাম---''হে প্রাণদাতা,তোমাকে নমস্কার। ''

একেএকে তিনজনকে কাঁধে করে ফাটলটা পেরিয়ে এসে নীলপর্বতের গোড়ায় বসে বুক ভরে নি:শ্বাস নিলাম। শরীরে আর কিছু শক্তি অবশিষ্ট নেই। তিনজনেরই নাড়ি চলছে দেখে নিয়েছি। হয়তো সামনেই জ্ঞান ফিরবে। এখানেও জঙ্গল,অসুবিধা তো আছেই। কিন্তু সবই আমাদের যুক্তি বুদ্ধির সীমানার মধ্যে। আর আতংকের মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে না। আমাদের চেনা পৃথিবীতে ফিরে এসেছি।

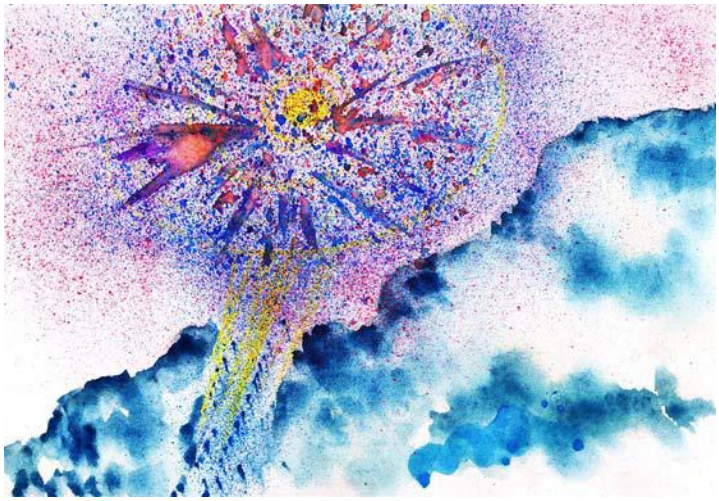

ব্যাগ থেকে রকেটটা জ্বালিয়ে আকাশে ছুঁড়ে দিলাম। দানিকেন আর থাঙ্গার চোখে পড়বে। ওটাই বিপদসংকেত। আমি জানি ওরা আসবে। আজ হোক,কাল হোক ওরা আসবে। আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

চোখ ভেঙে ঘুম নেমে আসছে।

পরের সংখ্যায়

মঙ্গলগ্রহের বুক থেকে আসা রহস্যময় ছোট ছোট মিসাইলগুলো সুইফট টাটল ধুমকেতুকে ধাক্কা মেরে মেরে তার অভিমুখ পৃথিবীর দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল কেন? ডঃ সত্যব্রত বসুর চাঁদের ল্যাবরেটরিতে নির্মীয়মান ম্যাটার- অ্যান্টিম্যাটার মিসাইল একাগ্নিকে ধ্বংস করতে কারা এসেছিলো? ছেলেকে নিয়ে উধাও সত্যব্রত কোথায় গেলেন? কেন তাঁর কোন সন্ধান নেই সর্বজ্ঞ মহাগণক বুদ্ধ- র কাছে? চোরাচালানকারী, ইউরোপার বুকের টারমক শিকারী কা পোন অরুণাচলের জঙ্গলে স্মৃতিহারানো যে কিশোরটিকে খুঁজে পেল তার আসল পরিচয় কী?

এই সবকিছুর আড়ালে গুঁড়ি মেরে যে ভয়াবহ পরিণতি এগিয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে তার হাত থেকে পৃথিবী কি রক্ষা পাবে শেষ পর্যন্ত? ভবিষ্যতের সেই রোমাঞ্চকর ইতিহাস নিয়ে আগামি সংখ্যা থেকে হাজির হবে ইন্দ্রশেখর- এর নতুন ধারাবাহিক “**অন্তিম অভিযান**।”

১। পরজন্ম

-পরজন্মে আমি গিরগিটি হয়ে জন্মাতে চাই।

-কেন?

-আমার হিন্দির দিদিমণি দুনিয়ায় শুধু আরশোলায় ভয় করে তো!

২। ভুল সংশোধন

প্রথমদিন অফিসে কাজ করতে এসে এক ছোকরা সারারাত অফিসে বসে খুটখাট করে কাজ করছিলো।পরদিন সকালে অফিসে এসেও তাকে কাজ করে যেতে দেখে তার বস তো ভারি খুশি। বলে, "তুমি তো খুব কাজের ছোকরা হে! কাজে এমন মনযোগ তোমার! তুমি অনেক উন্নতি করবে। এখন বলো দেখি কী এত কাজ করলে প্রথম দিনেই?"

ছোকরা হেসে একটা কম্পিউটারের কি বোর্ড এনে বসকে দেখিয়ে বলে, "এই দেখুন স্যার! এ অফিসের একশোটা কমপিউটারের সবকটা কি বোর্ডেরই অক্ষরগুলো উল্টোপাল্টা করে লাগানো। সারারাত জেগে তাই সবকটা কিবোর্ডের হরফগুলো খুলে ঠিকঠাক করে পরপর লাগিয়ে দিয়েছি!"

৩। কীভাবে মরতে চাও?

এ প্রশ্নটা শুনে এক বাসড্রাইভার বলেছিলো, "আমি আমার বাবার মতো শান্তিতে ঘুমের মধ্যে মারা যেতে চাই। ওনার বাসের প্যাসেঞ্জারগুলোর মত ওরকম চিৎকার করতে করতে, বাঁচবার জন্য লাফালাফি করে মরতে চাইনা কিছুতেই।"

৪। ফেসবুক

ছেলের ফেসবুক ওয়ালে বাবার মেসেজ—

"কীরে , কী করছিস? কোন খবরটবর নেই! মা খেতে দিয়েছে। এবার নিচে নেমে আয় তাড়াতাড়ি। সঙ্গে পোলাওটার ছবি আপলোড করছি!"

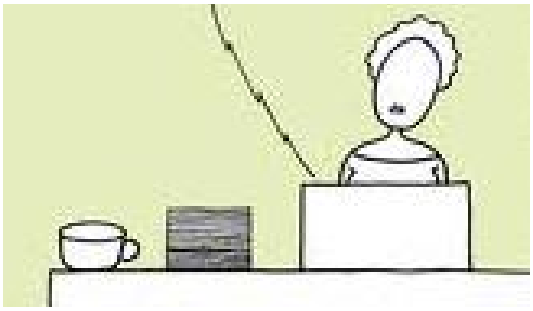

তিনটে ছড়া

অদিতি

।১।

তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্,
ভাঙল সবার ঘুম।
আয়রে সবাই নাচি,
আনন্দেতে বাঁচি।

।২।

ও আমার ছোট্ট ফুলগাছটি,
তুমি ফুল দিয়েছ সাতটি।
তোমার ফুলে মধু হবে
মৌমাছিরা আসবে যাবে।

।৩।

কবরখানায় হচ্ছে খানা,
খবর পেয়ে দিলাম হানা।
খাচ্ছে কারা? কারা আবার?
সবাই ‘তারা!’ খাচ্ছে কি?
কি আবার? মাংস-লুচি-পোলাও-ঘি।
ছিল যত মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো,
খাওয়ার পর নাচ করল শুরু,
সে কি নাচ! বাপ্ রে বাপ্!
তারপরে হল বিয়ে,
ঝুড়িতে চড়ে এল মেয়ে।
আলতা পরে বর বসে,
মাথায় বেঁধে গামছা কষে।
ক্রমে ক্রমে বাড়ে রাত,
এবার বুঝি হব ঘুমে কাত।
আর থেকে ভাই কাজ নাই,
জলদি জলদি বাড়ি পালাই।

গ্যালারি

দেবোপমা

অন্তরা

মহুল

বাঘা

পুরাণ কথা

শ্রীময়ূরেশ কথা

লেখা সংহিতা, রেখা অমৃতা

ত্রেতা যুগে মিথিলা রাজ্যের রাজা ছিলেন চক্রপাণি। তিনি মহাধার্মিক ছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে সুখ ছিল না। রাজ্যপাট কার হাতে দিয়ে যাবেন ভেবে কুল পেতেন না। তাঁর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না কিনা তাই।

একবার তাঁর রাজধানী গণ্ডকীতে এসেছিলেন ঋষি শৌনক। রাজার দুঃখ দেখে তিনি রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রানি উগ্রকে নিয়ে বছরখানেক সূর্যের তপস্যা করতে।

রাজারানি ঋষির পরামর্শ মতো তপস্যা শুরু করে দিলেন।

এর কিছুকাল পরে উগ্রর মা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। রাজার মনে আশার আলো দেখা দিল। তিনি অনেকদিন পরে খুব খুশি হলেন। কিন্তু যতো দিন যেতে লাগল উগ্র ততো অসুস্থ হতে লাগলেন। একসময় তাঁর গায়ের তাপ বেড়ে দাঁড়াল আগুনের থেকেও বেশি।

এই জ্বরের প্রকোপ সহ্য করতে না পেরে তিনি ধাইকে নিয়ে গেলেন সমুদ্রের কূলে। সেখানে তাঁর সন্তান বিসর্জন দিয়ে তিনি শীতল হলেন। রাজা খবর পেয়ে আবার তাঁর দুঃখে ডুবে গেলেন।

এদিকে সমুদ্রের মধ্যে সেই সন্তান ক্রমশঃ বেড়ে উঠল। তার গায়ে ভীষণ জোর হলো, তার তিন চোখ দেখা দিল। সে কাঁদলে ত্রিলোকে থরহরি কম্প হতে লাগল। তামাম সমুদ্রের জীব তার ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগল।

তখন সমুদ্রের দেবতা সেই সন্তানকে রাজা চক্রপাণির কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। রাজা তো পুত্র পেয়ে মহা খুশি। সমুদ্র থেকে পাওয়া বলে তার নাম দিলেন সিন্ধু।

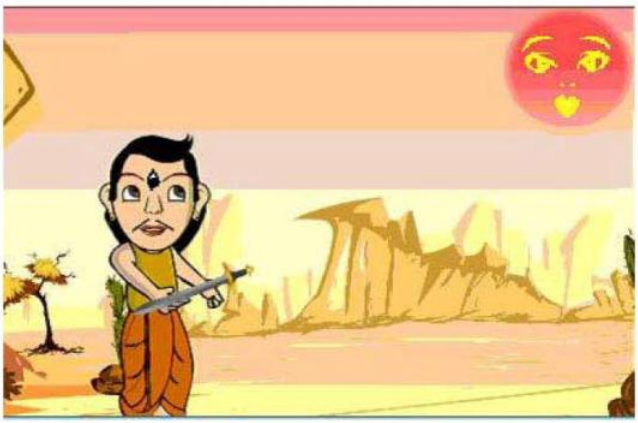

ব্রহ্মচর্য সেরে নানা শাস্ত্রে ও শস্ত্রে পাঠ নিয়ে সিন্ধু করল সূর্যের তপস্যা। তার কঠিন তপস্যায় তুষ্ট হয়ে সূর্য তাকে ত্রিলোক ধ্বংস করার অস্ত্র দিলেন। সে অপরাজেয় হয়ে গেল। ততদিনে সে যুবক হয়ে গেছে। রাজা চক্রপাণি তাকে রাজ্যের ভার দিয়ে বাণপ্রস্থ নিয়ে বনে চলে গেলেন।

মর্ত্য বিজয় করে সিন্ধু গেল পাতাল আর স্বর্গ জয় করতে। স্বর্গ জিতে সে বিষ্ণুকে নির্বাসিত করল মর্ত্যে, তার রাজধানী গণ্ডকীতে। এই স্পর্ধা সহ্য করতে পারলেন না দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি পার্বতী আর তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে স্বর্গ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন। আকাশে ভাসতে ভাসতে একটা সমতলভূমি পার্বতীর খুব মনে ধরল। সেখানেই তাঁরা সবাই নেমে পড়ে আশ্রম বানিয়ে বাস করতে শুরু করলেন।

একদিন পার্বতী দেখলেন মহাদেব গভীর ধ্যানে ডুবে রয়েছেন। তিনি জানতে চাইলেন, "দেবাদিদেব, আপনি কার ধ্যানে মগ্ন?" মহাদেব উত্তর দিলেন, "যিনি ত্রিলোকের রক্ষক তাঁর।" তখন পার্বতী আবার জানতে চাইলেন, "কে তিনি?" মহাদেব বললেন, "তিনি গণপতি।" তখন পার্বতী বললেন, "আমিও তাঁর ধ্যান করব।"

বার বছর লেখনাদ্রি পাহাড়ের মাথায় এক সুন্দর বনে পার্বতী ধ্যান করে গণেশকেই পুত্র হিসেবে ভিক্ষা করলেন। তারপর ভাদ্রমাসে শুক্লা চতুর্থীতে গণেশ এলেন পার্বতীর সন্তান হয়ে। ঋষিপুত্রদের সাথে বেড়ে উঠতে লাগলেন তিনি।

একদিন খেলতে খেলতে গণেশ গিয়ে পড়লেন এক আমবাগানে। সেখানে প্রচুর আম খাওয়ার পর আমের আঁটি নিয়ে লোফালুফি খেললেন। এই বাগানেই একটা গাছের মগডালে বসে একটা বিশাল ডিমে তা দিচ্ছিলেন এক মানবি তিনি গাছ থেকে নেমে ছেলেদের তাড়া করতে লাগলেন। তখন গণেশ সেই গাছটায় চড়ে ডিমটা ফাটিয়ে ফেললেন। অমনি একটা বিশাল ময়ূর বেরিয়ে এলো আর খাই খাই করে ধরতে গেল ছোটো ছেলেদের। গণেশ ময়ূরকে কাবু করে তার পিঠে চড়ে বসলেন। তখন সেই মানবী তাঁকে প্রণাম করে বললেন, "আমি বিনতা। এই ডিমটা আমার সন্তান। আমি একে রক্ষা করছিলাম যতক্ষণ না এর মালিক এসে ডিম ফাটিয়ে একে মুক্ত করে। আজ সেই দিন এসেছে। আমরা বাকি সন্তান — জটায়ু, শ্যেণ, সম্পাতি — নাগেদের হাতে বন্দি। দয়া করে তাদের মুক্ত করুন প্রভু।"

বশীভূত ময়ূরে চড়ে গণেশ ফিরে এলেন আশ্রমে। সেখানে ঋষিরা তাঁকে নাম দিলেন ময়ূরেশ। তারপর তিনি নাগেদের পরাস্ত করে মুক্ত করলেন দৈবি পাখিদের। তারওপরে তিনি একে একে পরাভূত করলেন সিন্ধুর আমলে যতো দানব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তাদের সকলকে। তাঁর ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে প্রজাপতি ঋষি ব্রহ্মা তাঁর দুই কন্যা, সিদ্ধি আর বুদ্ধির সাথে, ময়ূরেশের বিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু ময়ূরেশ তখনই বিয়ে করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর সামনে তখন একটাই লক্ষ্যঃ সিন্ধু বধ।

ময়ূরেশ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন দেখে শিবপার্বতী কৈলাসে ফিরে যেতে চাইলেন। তাঁদের সঙ্গে চললেন ময়ূরেশ। পথে যতো দানব তাঁদের আক্রমণ করল সব মারা পড়ল ময়ূরেশের হাতে। দানবদের এই হারে ভয়ানক রেগে গিয়ে সিন্ধু যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ময়ূরেশের বিরুদ্ধে। সেনাপতি করে পাঠালেন নিজের দুই পুত্র ধর্ম আর অধর্মকে।

যুদ্ধে তাদের হারিয়ে মেরে ফেললেন ময়ূরেশ। তারপর এলেন স্বয়ং সিন্ধু। তাঁরও দশা হলো তাঁর ছেলেদের মতোই। ত্রিলোকে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এল। বিষ্ণু ফিরে গেলেন বিষ্ণুলোকে। ময়ূরেশ বিয়ে করলেন সিদ্ধি ও বুদ্ধিকে।

তারপর তিনি বিদায় চাইতে এলেন শিবপার্বতীর কাছে। পার্বতী জানতে চাইলেন, "প্রভু আবার কবে আসবেন আমার সন্তান হয়ে?" ময়ূরেশ বললেন, "দ্বাপরে আসব আবার সিন্দুর বধ করতে।"

ছোটো ভাই কার্তিক বায়না জুড়লেন, "যেখানে যাবে আমাকেও সেখানে নিয়ে চলো না!" ময়ূরেশ বললেন, "আমি কি কোথাও যাচ্ছি নাকি! তুমি যেখানেই থাকো আমি সবসময় তোমার সঙ্গে থাকব"। এই বলে তিনি তাঁর ময়ূরটা কার্তিককে দিয়ে দিলেন। আর কার্ত্তিকের নাম রাখলেন, "ময়ূরকেতন"। তারপর তিনি অবিনশ্বরলোকে ফিরে গেলেন আবার।

সবুজ চোখের আলো

লোসিফ ডিক

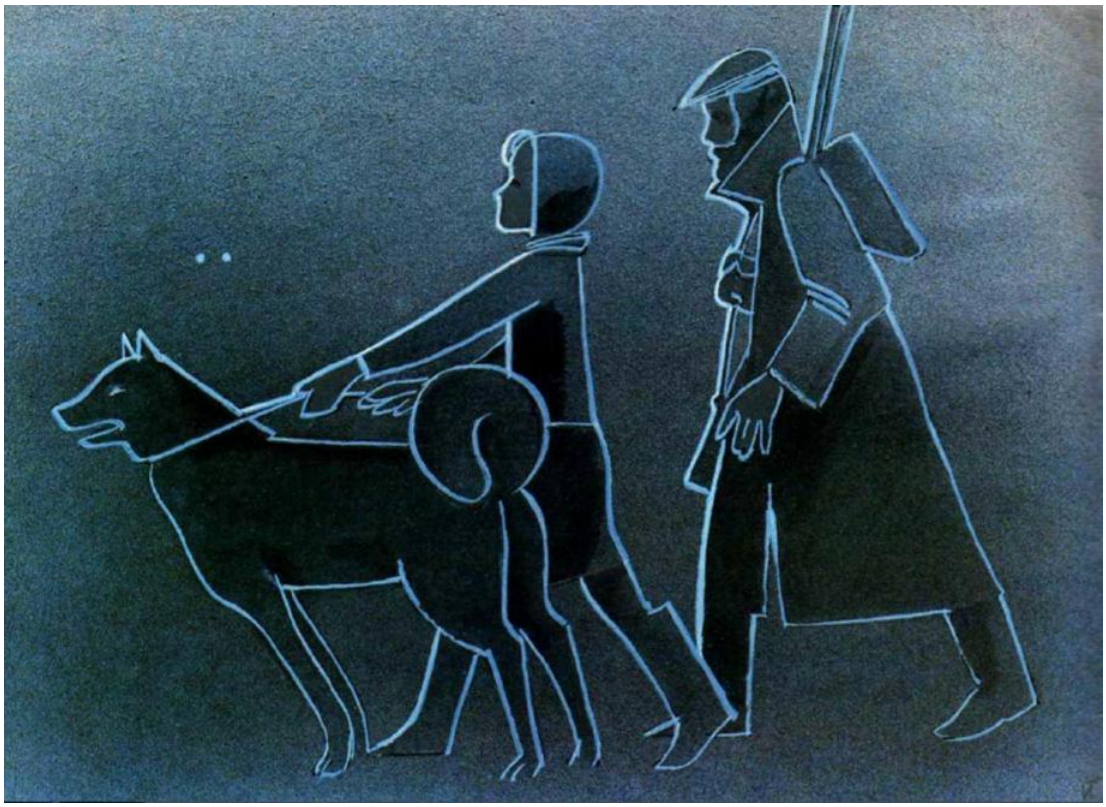

তানিয়ার বাড়ি তাইগার পেতুশক খনি এলাকায়। বাড়ি থেকে জঙ্গল পেরিয়ে দু কিলোমিটার দূরে একটা বড়োসড়ো বসতিতে তার স্কুল। সে আর সুরকা রোজ হেঁটে হেঁটে সেইখানে স্কুলে যায়। একদিন সেই বসতির পাহারাদার তাদের ডেকে বললো, "নেকড়ের একটা দল বেরিয়েছে বলে সবাই বলছে রে। সাবধান।" তানিয়ারা তার কথা বিশ্বাসই করলো না। নেকড়েরা কি শহরে আসে নাকি?

তারপর, একদিন স্কুলের শেষে সুরকা বললো, "আজ আমি এইখানেই রাতে থাকবো, বুঝলি? তুই আজ একা একা বাড়ি যা।" এই বলে সে আড়চোখে তানিয়ার দিকে তাকাল, বন পেরিয়ে একা একা বাড়ি যেতে হবে শুনে সে ভয় পেয়েছে কিনা তাই দেখতে। কিন্তু তানিয়া তো বেজায় সাহসী মেয়ে! সে একটুও ভয় না পেয়ে একাএকাই রওনা দিল।

জঙ্গলের মধ্যে একা একা হাঁটতে হাঁটতে অবশ্য তানিয়ার বেজায় ভয় লাগছিলো। হঠাৎ সে দেখে সামনে খানিক দূরে একজোড়া সবুজ আলো। "এই রে! নেকড়ে বোধ হয়!" এই বলে সে টর্চটা জ্বালিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে পড়লো। বুকটা তার একেবারে দুপদুপ করছিলো। খানিকক্ষণ

দাঁড়িয়ে থাকবার পর সবুজ আলোদুটো চলে গেল। তানিয়াও তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালালো।

পরদিনও সুরকা বললো, সে বসতিতেই থেকে যাবে। তার নাকি সেদিন সেখানে সিনেমা দেখতে যাবার কথা। তানিয়া ফের একা একা রওনা হল। যেতে যেতে যেই না জঙ্গলে ঢোকা, সে দেখে কি, সামনে একটা কালোমত কী যেন দাঁড়িয়ে আছে। তানিয়া ভয়ে একজায়গায় পাথরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলো, "আবার নেকড়ে এসেছে যে! এবার আমি কী করি?" একটু বাদে সাহস করে সে উল্টোদিকে ভোঁ দৌড় মেরে বসতিতে ফিরে গিয়ে পাহারাদারকে বললো, "জঙ্গলে নেকড়ে বাঘ দাঁড়িয়ে আছে পথ জুড়ে। তোমার পোলকান নামের গুণ্ডা কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে আমার সাথে চলো দেখি!"

"ওসব নেকড়ে টেকড়ে ছেড়ে রাতটা বসতিতে থেকে যা তুই," দারোয়ান বলল।

তানিয়া বলল, "উঁহু,আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটায় কিছু একটা গণ্ডগোল আছে।"

দারোয়ানকে নিয়ে সে যখন আবার জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছুল, দেখে কি, ঝোপের আড়াল থেকে কালোমত কী একটা বের হয়ে আসছে। জিনিসটা নেকড়ে, নাকি ভালুক? ভারী পা ফেলে খুব আস্তে আস্তে সে এগিয়ে আসছিল। সবুজ চোখদুটো জ্বলছিল তার।

"পোলকান, ধর!" বলে তানিয়া চিৎকার করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে পোলকান একটা বন্দুকের গুলির মত ছুটে গেল সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে ছায়াটা চিল চিৎকার করে উঠে বললো, "তানিয়া, পোলকানকে আটকা। আমি সুরকা।"

তানিয়া দৌড়ে গিয়ে দেখে , সেটা সত্যিই সুরকা, আর তার হাতের থেকে লাফ দিয়ে পড়ে একটা বেড়াল দৌড়ে পালাচ্ছে পোলকানের তাড়া খেয়ে।

"তুই এখানি এলি কী করে?" তানিয়া জিজ্ঞাসা করলো।

"তোকে সবুজ চোখো বেড়ালটা দিয়ে ভয় দেখাচ্ছিলাম। দেখছিলাম তুই ভয় পাস নাকি।"

"বোকা গাধা কোথাকার! আমায় ভয় দেখাবি তুই! ফুঃ! এখান থেকে একশো কিলোমিটারের মধ্যে কোন নেকড়ে বাঘ থাকতেই পারে না! খনির মাটি খোঁড়ার যন্ত্র আর বুলডোজারের শব্দের চোটে সব পালিয়ে গেছে।"

সুরকার অবশ্য ততক্ষণে দুষ্টুমির শাস্তি পাওয়া হয়ে গেছে। পোলকান তার হাতে এক মোক্ষম কামড় দিয়েছিল। শেষে তাকে তার ওপর আবার টিটেনাস ইঞ্জেকশনও নিতে হল। তাতে আবার ডবল ব্যথা।

ছবিঃ সংগৃহীত

বৈষ্ণব চূড়ামণি

শ্রী শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

হরিচরণবাবু পরম বৈষ্ণব। তিনি শাক্তদিগের দেবতার নাম করিতেন না। দুর্গাকে হাতি শুঁড়ের মা, কালীকে জিব বের করা দেবতা, শিবকে ষাঁড়ে চড়া ঠাকুর ইত্যাদি, বেলপাতাকে তেফেরেঙ্গার পাতা বলিতেন। তিনিও কখনও বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতেন না। সত্য কথা বলিতে গেলে তাঁর ষোল আনাই ভন্ডামি ছিল, কিন্তু বাহ্যিক গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন।

এক শাক্ত ব্রাহ্মণ নিজেকে গোস্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার বাটীতে পাচকের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিন হরিচরণবাবুর ইষ্টদেবতা আসিয়াছেন, তিনিও খুব নিটোল বৈষ্ণব। পাচক ব্রাহ্মণ গোস্বামী-তনয় শুনিয়া প্রভুজী তাহার হাতেই সেবা করিতে স্বীকৃত হইলেন। প্রভুজী স্নানান্তে তিলিক ছাপ করিয়া ঠিক যেন ‘ডেডলেটার অফিসের’ ফেরৎ চিঠির মত আকার ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর পাচকের রান্নাবান্না পর্যবেক্ষণের জন্য রন্ধনশালায় গেলেন। পাচক তখন ভাতের ফেন গড়াইতেছে। খুব ভারী হাঁড়ির ভাত ঢালিয়া পাচক ঠাকুর পূর্ব সংস্কারবশতঃ হাঁপ ছাড়িয়া দুর্গা বলিয়া ফেলিয়াছেন। প্রভুজী হাতি শুঁড়োর মার নাম শুনিয়া রাগে ‘জগাই মাধাই’ মূর্তি হইয়া পাচককে খুব গালি দিলেন ও ভাতের সহিত ঐ নামের সংস্পর্শে দোষ হইল বলিয়া ও অন্ন খাইবেন না বলিলেন।

পাচকও তখন রাগিয়া সমস্ত দ্রব্য স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিল- এই তোর ডালে দুর্গা, এই তোর শাকে দুর্গা, এই তোর তরকারীতে দুর্গা, এই তোর অম্বলে দুর্গা, এই তোর পায়সে দুর্গা।

প্রভুজী দেখলেন সমস্ত দ্রব্যই ঐ নাম স্পর্শ হইল, সুতরাং তাঁহার কোন দ্রব্যই সেবা হইবে না।

অগত্যা তিনি নিজেই ছোট হাঁড়িতে আলু ভাতে ভাত চাপাইলেন। ভাত নামাইয়া পাচককে আলুগুলি খুঁজিতে বলিয়া স্বয়ং তামাক খাইতে লাগিলেন।

পাচক একটি কাঠি লইয়া গরম ভাতের মধ্য হইতে আলু বাহির করিতে লাগিল। দশটি আলুর মধ্যে নয়টি পাওয়ার পরে আর একটা খুঁজিতে খুঁজিতে পাচক গান ধরিল—

কোন বনে গিয়েছে নবীন বাছুরীরে

আমার কোন বনে গিয়েছে নবীন বাছুরীরে

প্রভুজী পাচককে এই গানের কারণ জিজ্ঞাসা করায় পাচক গদগদ ভাবে কহিল---

বৃন্দাবনের মধ্যে যেমন প্রভু শ্রী কৃষ্ণের বাছুর হারাইলে তিনি বলিতেন—'কোন বনে গিয়েছে নবীন বাছুরীরে' তেমনি আমার অন্নরূপ অরণ্যের মধ্যে আলুরূপ বাছুরী হারাইয়া গিয়াছে তাই খুঁজিতেছি।

প্রভুজী এই কৃষ্ণলীলার গান শুনিয়া প্রেমে গদগদ হইয়া সজল নয়নে পাচককে বলিলেন—'বাবা তোমার এমন জ্ঞান তবে ঐ হাতি শুঁড়োর মার নামটা কর কেন?'

প্রভুজী আলুরূপ বাছুরীর সেবা করিলেন।

ছবিঃ সংগৃহীত

সেই আয়না

জয়ঢাক-পড়ুয়াদের জন্য এবারে কলম ধরলেন শিল্পী সুজয় রায়, তুলির সাথে কলমেও শব্দছবি আঁকায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি নিয়ে এসেছেন এক আশ্চর্য জাদু আয়না, যার বুকে ধরা পড়েছে পুরোনদিনের সব ছবি, বিহারের গ্রামদেশে কাটিয়ে আসা এক সুন্দর ছোটবেলার গল্পকথা। এসো, আমরা সবাই মিলে দেখতে বসি–

মন্টু মামার গল্প এতক্ষণ বলা হয় নি। ইনিও রুচিতে ক্লাসিক্যাল। গানের তানে ভরপুর মানুষ। যখন তখন গানের ঝর্ণাধারায় স্নান করছেন – at the drop of a hat। পাখির ডাকের মতই স্বতোৎসারিত তার তানের ঝঙ্কার। ছোটবেলা থেকেই মানুষটির সঙ্গীতমুখর স্বভাব। All this life's a song। তালিমের অপেক্ষা না রেখেই মার্গসঙ্গীতের তলাতল খুঁজে চলেছেন। গানের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে তবলায় সঙ্গত। তবলিয়া আর কণ্ঠশিল্পীর দ্বৈত ভূমিকা একাই পালন করে চলেছেন। এই রকম আনন্দ-প্রাণ মানুষের সঙ্গে কিশোর ভাগ্নেদের জমত ভাল। স্বভাবটা স্নিগ্ধ, সাহচর্যে জীবনের গুরুভার হাল্কা হয়ে যায়। প্রতিদিনই যেন পিকনিক।

ছুটির ঘন্টা বাজছে তাঁর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে।এদিকে আবার পরিহাসের ছোঁয়াচে রস জোগান দিয়ে চলেছেন সকলকে। অর্থ তাঁর হাতে খেলনার মত অবলীলায় আসত, ততোধিক ক্ষীপ্রবেগে খরচ হয়ে যেত। এও এক জীবনদর্শন। "যদি হায় জীবন পুরণ নাই হল তব অকৃপণ করে", তবে কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? সঞ্চয় করোনা, ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানকে অনাহারী রাখা চলবে না। বর্তমানটা যে বড্ড জরুরি! আমি দুরাশায় বুক বাঁধি না, অনাগত ভবিষ্যতের মজুরি খাটি না। আগাম দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেল।

মন্টুমামার যেমন দরাজ, দেদার স্বভাব, অর্থাৎ চরিত্রটা যতখানি চওড়া, শরীরটাও ততখানি ছিল মজবুত। ব্যায়ামবীর, নিখুঁত শরীর-শিল্পী, দেহটাকে এক গ্রিক ভাস্কর্যের মত করার চেষ্টা ও

তৎপরতা। সময়ের অপচয় না করে সর্বদা স্ব-শরীরে টুকটাক নির্মাণের কাজ করেই চলেছে। জানালায় লোহার গরাদগুলি মামার করমর্দনে বেঁকে-চুরে করুণ ব্যঙ্গরূপ ধরেছে। বাড়ির প্রত্যেকটা চেয়ার কাঁধে কাঁধে চড়ে বেড়াচ্ছে তাঁর। বসবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। ভাগ্নেদের পিঠে বসিয়ে ডনবৈঠক দেওয়া হচ্ছে। বাঁদরছানার মতো লেপ্টে রয়েছি তাঁর পিঠে, কুৎকুতে চোখে। মা-মাসী পড়ার কথা বললে আলামারির মাথায় মামা বসিয়ে দিচ্ছে আমাকে, পা দোলাচ্ছি আমি, নিচের দিকে তাকিয়ে বাঁদরের মত ভেঙ্চি কাটছি। স্বহস্তে বাদাম-পেস্তা বাটছে মামা নিজের জন্য, ভাগ্নেকেও খাওয়াচ্ছে শরীরটাকে লায়েক করবার জন্য। মন তাঁর বর্তমানে থাকত না, ঘোরাফেরা করত আরব্য-রজনীর দেশে। মামার কাছে কল্কে পেতে হলে পিঠে সুড়সুড়ি দিতে হবে, তা'হলে হারুণ-অল-রশিদের গল্পের ডালি খুলে যেত। গল্প বলার সুরে ভাগ্নে-ভাইপোরা সাপের মত কিলবিল করে মামার পাশে জড়ো হতাম। গল্পের উত্থান-পতনে কয়েকটা মাথা দুলতে থাকত। মন্টুমামার দর্শনবোধে কোন আফশোস নেই, একটি ব্যতিরেকে। নস্যির ডিবের গায়ে আঙুলের ডগায় তবলা লহর তুলে স্বগতোক্তি বেরিয়ে আসে, "হতাম যদি জমিদারের ছেলে, দশটা-পাঁচটা অফিসের পাট থাকত না। গান-বাজনার তালিমটা দস্তুর মতো হত, ব্যায়ামের খোরাকিটাও ভালরকম জুটত"। উপযুক্ত সঙ্গীতের ওস্তাদ আর আখড়ার পালোয়ানের সন্ধানে উড়ু উড়ু করত তাঁর মন।

একবার ইচ্ছা হল পার্ক সার্কাস ময়দানে সার্কাস দেখে আসি।। রবিবারের সকাল, মামা চলল টিকিট কিনে আনতে। আমি সঙ্গ দিলাম ল্যাংবোটের মত। কিন্তু সার্কাসের তাঁবুর সামনে এক মাইল সমান লড়াকু লাইন। মামা লাইনে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে fine করতে চায় না, দেহটা মন্দির কিনা! আমি রণে ভঙ্গ দিলাম, কিন্তু মামার উদ্দেশ্য অন্যরকম। তাঁবুর সামনে বহু পুলিশ ঘোড়ার পিঠে জাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা দেখলেই মনে হয় বধ্যভূমি। জামার আস্তিন

গুটিয়ে, বাইসেপ ফুলিয়ে আমার দলনেতা লোহার কোলাপসিব্‌ল গেটের সামনে হাজির হ'লো। অম্লানবদনে পুলিশ সার্জেন্ট্‌কে বলল, 'সার্কাসের ম্যানেজারকে একবার ডাকুন তো। আমি মনোহর আইচের আখড়া থেকে আসছি। বিশ্বশ্রী, চেনেন তো? আমি প্রধান শিষ্য, বুকে হাতি তুলি"। ভেতরে খবর গেল, ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে হাজির। "আপনার সার্কাসে বুকে হাতি তুলবার আর্টিস্ট আছে কি?" — মামার প্রশ্ন। উত্তর, "হ্যাঁ স্যার আছে বৈকি, লঙ্কাস্বামী আয়েঙ্গার।" মামা অধৈর্য হয়ে বললেন,"সেরকমটা নয়, যে বুকে হাতি তোলে, আমি তাকে শুদ্ধ বুকে তুলি কিনা। বুকে পিঠে মানুষ করি হাতিদের, লোফালুফি করি তাদের নিয়ে।" ম্যানেজার সসম্ভ্রমে দুপা পেছিয়ে দাঁড়াল। আমি এদিকে ভয়ে সেঁধিয়ে যাচ্ছি মাটিতে, মামার বেপরোয়া সংলাপ শুনে। চটিজোড়া হাতে তুলব কিনা ভাবছি। মামা বলে চলেছেন, "এই যে দেখছেন আমার ভাগ্নে। সবে মনোহর আইচের আখড়ায় টিকি বেঁধেছে। এখন শরীর বলতে কিছুই নেই, টিকটিকির মতো দেখতে, সবে হাফ্‌ আখড়াই। ভবিষ্যতে আমি যাকে বুকে তুলি, সে যে হাতিকে বুকে নেয়, সবশুদ্ধ তুলে নেবে।" এতক্ষণে আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। আমাদের ধরে নিয়ে সার্কাসের অকুস্হলে ফেলে দেবে না তো? মা-মাসীর কাতর মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল; স্পষ্ট দেখলাম হাতিকে বুকে নিয়ে বসুন্ধরার প'রে শুয়ে জলছবি হয়ে গেছি, গলায় বিদায়ের মালা। হাতির পিঠে ম্যানেজার বসে দর্শকের দিকে চুম্বন ছুঁড়ে দিচ্ছে। চারিদিকে দর্শকের হাততালি। মন্টুমামা আমার শরীরের ভগ্নাবশেষ খুঁজে পাচ্ছেন না, কারণ আমি জলছবি হয়ে গেছি যে! কিংবা মামা হাতির শুঁড় থেকে ঝুলে পড়ে হাওয়ায় হামা দিচ্ছে। ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করল, "কী চাই স্যার?"

মামার উত্তর, "গোটা দুই ফ্রি পাস, সামনের সারিতে। বুঝতেই পারছেন আমি artist। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটা আমার মানায়না।" দুটি পাস নিয়ে আমরা বিজয়গর্বে বাড়ি ফিরলাম। সন্ধ্যাবেলা মন্টুমামা সাজগোজ করে মুখে পাউডার মেখে সার্কাস দেখে এলেন। সঙ্গে আমিও গেলাম। ছোটমামার কাপ্তান জামা পরে।

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

ইমন চ্যাটার্জি

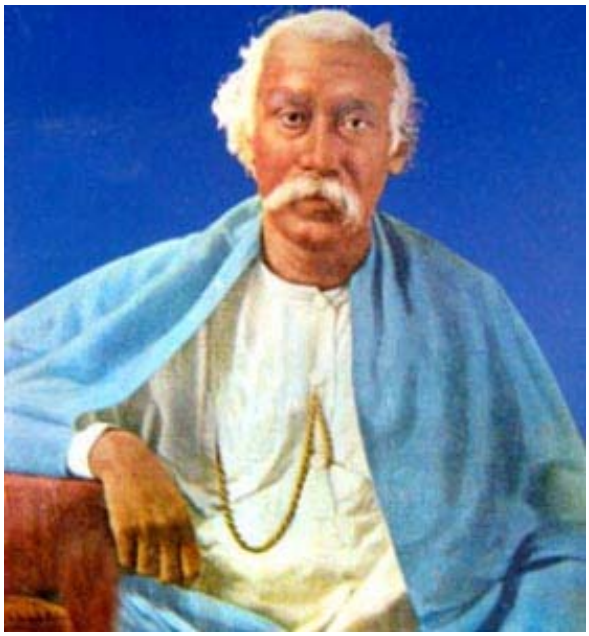

আধুনিক ভারতবর্ষের নবযুগের সূচনার প্রাণপুরুষ হলেন রাজা রামমোহন রায়। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁরই একজন শিষ্য।

১৮৩৩ সালের ২রা নভেম্বর ডাঃ মহেন্দ্রলালের জন্ম হয় হাওড়া জেলার পাইকপাড়া গ্রামে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে, ছোটমামা মহেশচন্দ্র ঘোষের কাছে থেকে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ সালে হেয়ার স্কুল থেকে "জুনিয়র বৃত্তি" নিয়ে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানের দিকে তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। প্রিয় বিষয় ছিল অঙ্ক।

এই সময়েই তাঁর হাতে আসে মিল সাহেবের বিখ্যাত লজিকের বই ও রেঃ মিলনরের "টুর রাউন্ড দি ক্রিয়েশন"। বইগুলো পড়ে ফলিত বিজ্ঞানে, মানে হাতেকলমে পরীক্ষানিরীক্ষা করা যায় এমন বিজ্ঞানে তাঁর ঝোঁক হয়। কিন্তু সে সময় এ দেশে ফলিত বিজ্ঞান পড়ার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। শুধু মেডিকেল কলেজে হাতেকলমে কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান পড়ানো চালু ছিল। কাজেই মহেন্দ্রলাল ১৮৫৪ সালে এই কলেজে ভর্তি হলেন। তিনি যখন দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছেন তখন কলেজের চক্ষুবিভাগের শিক্ষক ডাঃ আচার্যের অনুরোধে অনুরোধে আলোকবিদ্যা সম্পর্কে তিনি যে বক্তৃতা দেন তার শ্রোতারা বেশিরভাগই পঞ্চম বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

১৮৬০ সালে এল এম এস ও ১৮৬৩ সালে 'এম ডি' পরীক্ষায় ফার্স্ট হন মহেন্দ্রলাল। সূর্য গুডিভ চক্রবর্তীর পরে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বাঙালি এম ডি।

ডাঃ মহেন্দ্রলালের কর্মজীবন শুরু হয় স্বাধীন ডাক্তারি ব্যবসা দিয়ে। শুরু করবার কম সময়ের মধ্যেই নাম ও যশ দুই-ই লাভ করেন তিনি। পরবর্তী সময়ে ডাঃ মর্গ্যানের লেখা একটি বই পড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতি অনুপ্রাণীত ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং অ্যালোপ্যাথি

ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেন। তিনি "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষজীবনের চিকিৎসার ভার নেন।

১৮৬৮ সালে মহেন্দ্রলাল "ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন" নামে একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। ১৮৬৯ সালে তাঁর লেখা প্রবন্ধে তিনি বিজ্ঞানচর্চার জন্য ভারতবাসীর নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরির স্বপ্ন দেখলেন। পরের বছর, মানে ১৮৭০ সালে এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে "ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা" বা "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স"র সূচনা হয়। কালক্রমে এটি বিজ্ঞান গবেষণাগারে পরিণত হয় ও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী সি.ভি.রমন

হাওড়ায় মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্মভিটা

এইখানেই তাঁর গবেষক জীবন শুরু করেন ও নোবেল পুরস্কার পান।

মহেন্দ্রলাল সরকার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষকে বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। এই বিখ্যাত মনিষী "বিজ্ঞান সভা" প্রতিষ্ঠার আগেও তিনি প্রচুর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে দান করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "সায়েন্স ডিগ্রি" কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ডঃ পি. কে. রায় ও নীলরতন সরকার প্রমুখরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ানো শুরু হবার পেছনেও এই কমিটির বিরাট অবদান ছিল।

১৯০৪ সালে ২৩ শে ফ্রেব্রুয়ারি অক্লান্ত পরিশ্রমী বিজ্ঞানী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনাবসান ঘটে। আধুনিক ভারতে বিজ্ঞানভাবনার এই অন্যতম জনককে জয়ঢাক সেলাম জানায়।

ছবিঃ সংগৃহীত

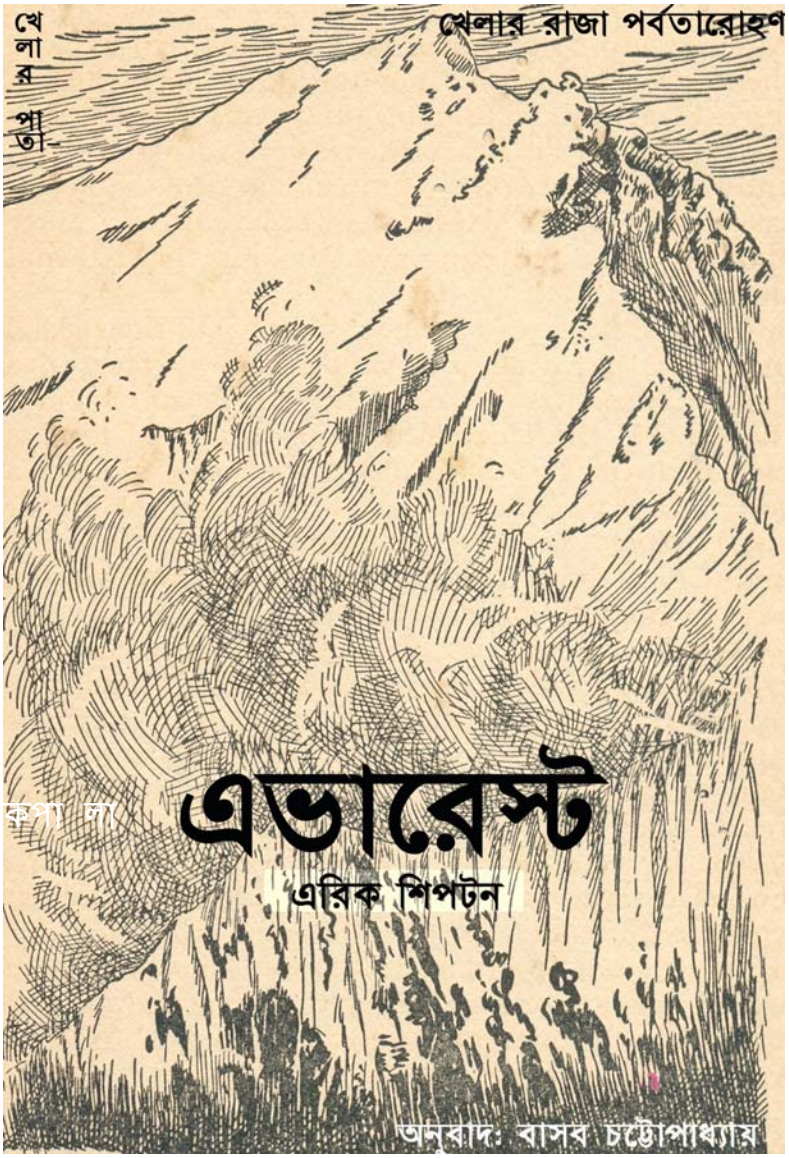

১৬ ই মে ম্যালরি ও সমারভিলের সঙ্গে তিন নং ক্যাম্পে স্টার্ট, নর্টন এবং মোরসেড দলভুক্ত হল। কিন্তু সবকিছু মসৃণভাবে চলছিল না। অভিযাত্রী ফিঞ্চ সহ দলের অধিকাংশ সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফিঞ্চ-ই একমাত্র সদস্য যাঁর কৃত্রিম অক্সিজেন ব্যবহারের প্রতি ছিল ভরসা।

এর মধ্যে অন্য এক সমস্যা সৃষ্টি হল।অভিযানের যন্ত্রপাতি,খাবার এবং রান্নার জিনিস উচ্চ হিমবাহে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে শেরপা এবং তিব্বতী মালবাহকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওপরের শিবিরে মাল পৌঁছে দিতে রাজি করানো হল। এ কাজটা দলে নিষিদ্ধ ছিল।কিন্তু তখন অভিযাত্রীরা নিরুপায়। ফলে অভিযানে বিলম্ব হতে লাগল। এছাড়াও খারাপ আবহাওয়ার কারণে ম্যালরির মন-খারাপ হয়ে গেল। একগুচ্ছ কালো মেঘ দক্ষিণ আকাশে দেখা যেতেই বর্ষার আশঙ্কায় অভিযাত্রীদের হতাশা আরও বাড়তে থাকল।

এই পরিস্থিতিতে অভিযাত্রীরা পরিকল্পনা বদলানোর কথা ভাবতে লাগলেন। ঠিক হল ম্যালরি এবং সমারভেল অক্সিজেন ছাড়া অভিযানের জন্য প্রথম প্রস্তুত হবেন। নর্থ কল থেকে আরও বেশি উচ্চতায় ২৫০০০ ফুটে প্রথমটি এবং ২৭০০০ ফুটে দ্বিতীয় শিবিরটি স্থাপন করবেন। দ্বিতীয় দলটিতে ফিঞ্চ এবং নর্টন অক্সিজেনের সাহায্য নিয়ে অভিযান করবেন।

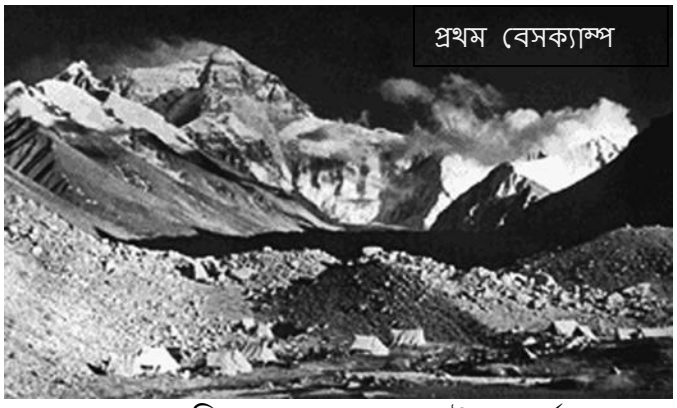
প্রথম বেসক্যাম্প

ঠিক হল ম্যালরি, সমারভিল, নর্টন এবং মোরসেডের মত অভিযাত্রীদের সাথে স্টার্ট এবং দশজন শেরপার যৌথ প্রচেষ্টায় ১৭-ই মে নর্থ কলে চতুর্থ শিবির স্থাপন হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হল এবং ১৮-ই মে বিশ্রামের পর ১৯ তারিখ তৃতীয় ক্যাম্পে ফিরে আসা হল।

২০ তারিখ সকাল ৭.৩০ টায় দুর্গম পথে পভিযানের উদ্দেশ্যে চারজন আরোহী এবং নজন শেরপা অগ্রসর হলেন। প্রত্যেকের পিঠে ২০ পাউন্ড-এর বোঝা। তাঁরা ঠিক করলেন ঐদিনই নর্থ কল থেকে আরো ৩০০০ ফিট উচ্চতায় ২৬০০০ ফুটে প্রথমে শিবির স্থাপন করবেন।

গত বারের অভিযানে ম্যালরি দেখেছিলেন নর্থ কলে অভিযানের শুরুতেই রাস্তা অতিক্রম করা ছিল সহজ। আবহাওয়া ছিল শান্ত সুন্দর। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পর থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে থাকল। ক্রমশঃ ঠান্ডা হাওয়া বইতে থাকে, সূর্য ঢেকে যায় মেঘে, হাড়কাঁপানো ঠান্ডা এবং অক্সিজেনের অভাবে মন এবং শরীরের অবস্থার আবনতি হতে থাকে। প্রতিটি পদক্ষেপই এত কষ্টসাধ্য যে চিন্তাশক্তিও লোপ পেতে থাকে।

এই রাস্তা যেহেতু দ্রুত অতক্রম করা অসম্ভব। একটু ধীর গতিতেই চলতে চলতে দুপুর দুটোর সময় অভিযাত্রী এবং পোর্টাররা ২৫০০০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছলেন। অতি উচ্চতায় অসুস্থ হয়ে পড়বার আশঙ্কায় মালবাহকরা নীচে নেমে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। গোটা জায়গাটা ছিল পাথুরে, অমসৃণ। ফলে ক্যাম্প করবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেতে সময় লাগছিল।বহু খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে শিবির স্থাপনের উপযোগী জায়গা পাওয়া গেল।

শিবির স্থাপন করে পোর্টারদের নীচে ফিরে যেতে বিকেল তিনটে বেজে গেল। তাঁবু ফেলা হতেই আরোহীরা ঠান্ডার প্রকোপ থেকে বাঁচতে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এর আগে এই পর্বতারোহীরা কেউই এত উচ্চতায় (২৫০০০ ফুট) রাত্রিবাস করেননি। চিকিৎসকরা বলেন এত উচ্চতায় রাত্রিবাসে ঘুমের মধ্যেই ঠান্ডায় অভিযাত্রীদের প্রাণ সংশয় ঘটতে পারে।

মোরসেড, ম্যালরি, সমারভিল, নর্টন

অভিযাত্রীরা অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতি উচ্চতায় এবং কনকনে ঠাণ্ডায় তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। প্রায় অনেকেই তুষারক্ষতে আক্রান্ত হলেন। সবচেয়ে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন অভিযাত্রী মোরসেড। ঐ ছোট্ট তাঁবুতে অভিযাত্রীরা দীর্ঘ রাত্রিযাপনের এক বিভৎস অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন।

ভোর থেকে ঝিরঝির করে তুষারপাত শুরু হলেও, সকাল ৮টার মধ্যে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেল। আরোহীরা এগোতে থাকলেন। কিছু রাস্তা হাঁটার পর কিন্তু দলের অন্যতম সদস্য মোরসেড এতই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে তাঁকে তাঁবুতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। বাকি তিন অভিযাত্রী সন্তর্পণে এগোতে থাকলেন। কারণ আগের রাতে নতুন বরফ পড়ায় রাস্তা ভীষণ পিচ্ছিল। পা ফসকানোর ভয়ে পা টিপেটিপে অতি সতর্কতার সাথে অভিযাত্রীরা এই কষ্টসাধ্য এবং বিপজ্জনক পথ ধরে এগোতে থাকলেন। শ্বাস নেবার জন্য প্রতি মিনিট অন্তর তাঁদের থামতে হচ্ছে তখন। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ উচ্চতার সাথে সাথে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে।এমনি করে ঘন্টায় গড়ে মাত্র চারশ ফুট রাস্তা তাঁরা আরোহণ করতে পারলেন। অভিযাত্রীরা। বুঝতে পেরেছিলেন এই অতি উচ্চতায় দ্রুত আরোহণের চেষ্টা করলে শীর্ষারোহণ করে তাঁরা জীবিত অবস্থায় ফিরবেন না।। পরে ম্যালরির লেখা চিঠিতে পাওয়া যায়, "আমার সন্দেহ ছিল উত্তর-পূর্ব ধার ধরে ২ ঘন্টা আরোহণের পরে ৪০০ ফুট পথ বাকি থাকত।"

আমাদের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার যে তাঁরা ঐ পথ অতিক্রম করার চেষ্টা করেননি। কারণ নর্থকলের কাছাকাছি নেমে আসবার সময় হিমালয়ের আবহাওয়ার অবনতি হতে থাকে।

বিকেল ৪টার সময় পঞ্চম শিবিরে পৌঁছে। অসুস্থ মোরসেডকে সাথে নিয়ে আরো ২০০০ ফুট নীচে চতুর্থ শিবিরের উদ্দেশ্যে নামতে লাগলেন তাঁরা। দিনের আলো চলে যাওয়ার পর আরো তিনঘন্টা কেটে গেছে ততক্ষণে। তবে পথ তুলনামূলক কম বিপজ্জনক হওয়ায় তাঁদের অন্ধকারে নীচে নামতে তখন অসুবিধা হয়নি।। কিন্তু দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করার এমন ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতায় তাঁদের শরীর অবসন্ন হয়ে এল।। এই পরিস্থিতিতেই দুর্ঘটনা ঘটবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।। তাই এই সময়ই প্রয়োজন বিশ্রামের।। একসময় তাঁরা ছোট একটা ক্লিফ-এর ওপর

সাময়িক থামলেন। কিন্তু বিশ্রামের পক্ষে এটি একটু খাড়াই ছিল। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এলাকাটিকে অন্ধকার গ্রাস করবার আগেই নর্থকলে ফিরে আসবেন। এই ২৭০০০ ফুটের উচ্চতাই শেষ বিন্দু যেখান থেকে তাঁদের ফিরে যেতে হবে।

পর্বতের উচ্চতা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নির্ধারণ করতে হলে থিয়োডলাইট যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। অ্যালারয়েড ব্যারোমিটারও বায়ুচাপ নির্ধারণ করতে পারে। ও তার থেকে কোন জায়গার উচ্চতাও মোটামুটি এই যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া যায়। যেহেতু এইসব উপকরণ মূল শিবিরে ছিল, সেহেতু ম্যালরি এবং তাঁর সহ-অভিযাত্রীদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, যে একেবারে ঠিক কত উচ্চতায় তাঁরা ছিলেন।

তাঁরা তখন এভারেস্ট শীর্ষবিন্দু থেকে মাত্রই ২০০০ ফুট নীচে। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে সাথে ঐ সময় শিবির স্থাপনের উপযুক্ত উপকরণ থাকলে শৃঙ্গ আরোহণ অনায়াসেই করা সম্ভব হত।। কিন্তু তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই স্থান কতটা বিপদসঙ্কুল অভিযাত্রীরা তা বুঝতে পারেন নি।। শুধু তাই নয় পাথরের দেওয়ালে বরফের আস্তরণ থাকায় আরোহণ প্রায় অসম্ভব। কঠিন।

বরফের ঢাল আর ভাঙা পাথরের ধার ধরে ম্যালরির নেতৃত্বে দলটি নামতে থাকল। পাথুরে পথ তেমন বিপজ্জনক না হলেও, ঢাল অতি সন্তর্পণে অতিক্রম করতে হবে, নচেৎ আরোহীদের ১০০০ ফুট নীচে রংবুক হিমবাহে নিমজ্জিত হতে হবে।। তাঁরা সকলে একই দড়িতে বাঁধা।

হঠাৎ তৃতীয় ব্যক্তির পিছলোনোর সাথে সাথে শেষ ব্যক্তি নীচের দিকে দ্রুত পড়তে থাকল। দড়িতে ঝাঁকুনি পড়তেই তাঁদের দুজনের ওজনের টানে দ্বিতীয় ব্যক্তি নীচের দিকে গড়াতে থাকল। মুহূর্তের মধ্যে ম্যালরি কোনদিকে না তাকিয়ে আইস অ্যাক্সটা বরফের মধ্যে পুঁতে দড়িটা কুঠারটিতে জড়িয়ে বেঁধে দিলেন।

ক্রমশ

গত সংখ্যার পর

“মাসতিনেক এইভাবে আটক থাকবার পর জেলখানার এক পাহারাদারকে হাত করে বাবা নাগপুরের এক বন্ধুস্থানীয় সাহুকারের কাছে আমাদের আটক হবার খবর পৌঁছোবার বন্দোবস্ত করলেন। তিনি খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি আমাদের ছাড়াবার জন্য তোড়জোড় শুরু করলেন। তবে কাজটা সহজ ছিল না। রাজদরবারে ব্রিজলালের বেজায় ক্ষমতা। বাবার বন্ধু যতবারই কথাটা দরবারে তোলবার চেষ্টা করেন সে তা বানচাল করে দেয়। শেষমেষ তিনি নাগপুরের প্রধান সাহুকারের কাছে সব খুলে বলে তাঁকে দিয়ে মন্ত্রীকে ধরাতে তবে গিয়ে বরফ গলল। একদিন খবর এলো, পরদিন দরবারে আমাদের অপরাধের শুনানি হবে। সেইমতো পরদিন আমাদের নিয়ে যাওয়া হল পেশকার নারায়ণ পণ্ডিতের এজলাসে। সৎ মানুষ হিসেবে পণ্ডিতের তখন খুব নামডাক। তবে ব্রিজলাল ছিল পণ্ডিতের মুৎসুদ্দি। তার ওপর তাঁর অগাধ ভরসা। শুনানির সময় সে খুব গুছিয়ে বাবার বিরুদ্ধে নালিশ সাজালো। বলে, দেশের আইন হলো কোন সাহুকার পুত্রসন্তান ছাড়া মারা গেলে তার সম্পত্তি সরকারের ঘরে যায়। জয়সুখলালের টাকাপয়সা অনেক ছিল, কিন্তু দুটো মেয়ে বই সন্তান ছিল না। আইনমোতাবেক তার মৃত্যুর পরে তার পরিবারের হাতে কোন সম্পত্তিই যাবার কথা নয়। কিন্তু আমার বাবা নাকি আইন ভেঙে তার বৌ-মেয়েকে জয়সুখলালের সব টাকাপয়সা দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছেন। এইরকম নানা অপবাদ বাবার নামে দিয়ে শেষমেষ সে বলে, ‘আপনি সাক্ষাৎ ধর্মরাজ, আপনিই এর বিচার করুন। জয়সুখদাসের সম্পত্তির খবর নিতে বোরি গিয়েছিলাম আমি নিজে। সরকারের কাজ করতেই তো গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন এই পাপীর হাতে আমায় যা অপমান সইতে হয়েছে তার কথা ভাবলে আমার রক্ত টগবগ করে ফোটে।সে খবর আপনার দরবারে পেশ করলে মুণ্ডুটা এর আর ঘাড়ের ওপর রাখতেন না আপনি। শুধু এর পরিবারের কথা ভেবে আমি সে অপমানও হজম করেছি। কিন্তু তারপর, বারবার সমন পাঠানো সত্ত্বেও এ যখন তার মান রাখলো না, তখন বুঝলাম সরকারকেও এ আর ভয় পায়না। তখন বাধ্য হয়ে আমি একে বন্দি করবার আদেশ দিয়েছি ধর্মাবতার।’

“‘ইয়া আল্লা। সব মিথ্যে ধর্মাবতার,’ বাবা চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘আমি সরকারের নমক খেয়েছি। আমি কি সরকারের হুকুম কখনো অমান্য করতে পারি? যদি অনুমতি দেন

তাহলে এই শয়তানটা আপনার বান্দার ওপরে ক'মাস ধরে যে কী অত্যাচারটাই করেছে সেসব কথা আমি হুজুরে পেশ করতে চাই।'

"পণ্ডিত বললেন, 'তোমার কথা কাল শোনা হবে। আজকের মধ্যে তুমি যা বলতে চাও সেসব বেশ গুছিয়ে লিখে রাখো।'

"বাবা তখন আবেদন জানালেন, তাঁকে যেন অমন চোরের মত জেলে আটকে না রাখা হয়। দুজন চেনা সাহুকার বাবার হয়ে জামিন দাঁড়ালেন। ব্রিজলাল অবশ্য অনেক প্রতিবাদ করেছিলো। কিন্তু পণ্ডিত তার কথা না শুনে বাবার জামিন মঞ্জুর করে দিলেন।

"সন্ধেবেলা অনেক মুসাবিদা করে, ব্রিজলালের সব কূকীর্তির কথা ফলাও করে জানিয়ে ফার্সি ভাষায় বাবার আবেদন লেখা হল। পরদিন দরবারে আমরা অনেক আশা নিয়ে সেই আবেদন হাতে গিয়ে পৌঁছোলাম। দুপক্ষের কথাবার্তা শুনে পণ্ডিত ব্রিজলালকে তার দুর্ব্যবহারের জন্য বকুনি আর বাবাকে, সরকারের হুকুম না মানার জন্য সামান্য জরিমানা করে ছেড়ে দিলেন। এজলাস থেকে বেরিয়ে আসার সময় দেখি ব্রিজলাল কুটিল চোখে আমাদের দিকে দেখছে।

"বাবার সাহুকার বন্ধুর কাছে কয়েকদিন কাটিয়ে শরীর টরীর সারিয়ে আমরা যখন ফেরার পথ ধরেছি, তখন সাহুকার বলেন, 'প্যাটেলজি, ব্রিজলাল অত সহজে তোমায় ছাড়বে না।ব্যাটা আদালতে গরুর মত শান্ত আর আদালতের বাইরে বাঘের মত দাঁতনখ বের করে। আমাদের প্রধান সাহুকার ব্যাপারটায় হাত না দিলে এত সহজে তুমি ছাড়া পেতে না। কিন্তু এখন থেকে সাবধান। ব্রিজলালের লোকজন তোমার ওপর বদলা নেবার চেষ্টা করবেই এই বলে রাখলাম। কথাটা খেয়াল রেখো।'

"বাবা মাথা নাড়লেন, 'রাখবো। তবে মামুদ প্যাটেলকে আর একবার ধরতে পারবে এত লম্বা হাত এই ব্রিজলালের হবে না ভাই।'

"নাগপুরের সাহুকার যে মিথ্যে বলেন নি তার প্রমাণ বাড়িতে পৌঁছোবার কদিন পর থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। হঠাৎ করেই দেখা গেল গ্রামে অনেক নতুন, অচেনা মুখ ঘোরাঘুরি করছে। সেই দেখে বাবাকে বারবার আমরা সাবধান করেছিলাম, রাতবিরেতে বেশি বাইরে ঘোরাফেরা কোরো না। কিন্তু বাবা আমাদের কথা শুনলে তবে তো! বলেন ও কিছু নয়। কোন মুসাফির টির হবে। ফলে বাবার যখনতখন এদিক সেদিক যাওয়া আসা বন্ধ হল না। মা ভয় পেয়ে আমায় ডেকে বললেন, 'তুই সবসময় তোর বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকে পাহারা দিস।'

"তার পর থেকে আমি ছায়ার মতো বেশ কয়েকদিন বাবার সঙ্গে লেগে রইলাম। রোজ সন্ধেবেলা ক্ষেত থেকে নিজে সঙ্গে করে বাবাকে বাড়ি নিয়ে আসতাম। কিন্তু একদিন রাত্রে আখের খেতে কাজ করতে গিয়ে বেশ দেরি হয়ে গেল আমাদের। বাড়ির দিকে খানিকটা পথ আর দু একজন চাষী আমাদের সঙ্গেই ছিল। তারপর এক জায়গায় এসে তারা অন্যদিকে চলে

গেল। তখন সোজা রাস্তায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হলে আমাদের যে রাস্তাটা ধরতে হতো সে পথে অন্ধকার হবার পর লোক চলত না মোটে। বাবাকে বললাম, 'চলো ঘুরপথে যাই। দেরি হলে হোক একটু।' বাবা আমায় এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে সেই সোজা রাস্তাটাই ধরলেন।

"অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে, হঠাৎ দেখি সামনে খানিক দূরে একটা ঝোপের মধ্যে আলোর ঝিলিক! কেউ যেন গাদা বন্দুকের চকমকি ঠুকলো। আমি বাবাকে ডেকে বললাম, 'বাবা, বিপদ! সামনের ঝোপের মধ্যে কেউ বন্দুকের পলতে জ্বালিয়েছে।'

"বাবা হেসে বললেন, 'বুদ্ধু! জোনাকি দেখে ভয় পেয়েছিস তুই। আমার ছেলে হয়ে তুই ডরপুক হয়ে গেলি!'

"বাবার মুখের কথাটা শেষ হতে না হতে গুড়ুম গুড়ুম করে তিনবার শব্দ হল। বাবা আমার চোখের সামনে গড়িয়ে পড়ে গেলেন আর আমার পিঠে আর পায়ে ভীষণ যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়লো। আমি কোনমতে কয়েক পা হেঁটে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। অমনি তিনটে লোক ঝোপের থেকে খোলা তলোয়ার হাতে বের হয়ে এসে পা দিয়ে আমার শরীরটা উলটে দিয়ে আমার মুখ দেখে বলে, 'আরে এ তো ভুল লোক!'

"শুনে অন্য একটা লোক এগিয়ে এসে আমার মুখটা দেখে বলে, 'না না ভুল হয়নি। এ হচ্ছে শয়তানটার ছেলে। অন্যটা তাহলে খোদ শয়তানটাই হবে। আয় দেখি--'

"এই বলে আমায় ছেড়ে তারা আমার বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখে নিয়েই চিৎকার করে বলে, 'আলমুহদুল ইল্লা। শয়তানটা শেষ হয়েছে! মালিক খুশি হবে।'

"অন্যজন বলে, 'উঃ, অন্ধকারে বসে বসে গায়ে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। শেষমেষ ব্যাটাকে শেষ করা গেল।এখন চল পালাই। এটার-এর মধু প্যাটেল আমাদের জন্য ঘোড়া তৈরি রেখেছে। একেবারে নাগপুরে গিয়ে থামবো।'

"সেই ঠাণ্ডা , অন্ধকার রাতে খোলা আকাশের নিচে আমি পড়ে রইলাম। একসময় দূরে অনেক মানুষের গলাও পেয়েছিলাম। আমাদের নাম ধরে ডেকে খোঁজাখুঁজি করছিল সবাই। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে সংকেতও দিচ্ছিল। কিন্তু আমার তখন নড়াচড়া করার বা একটু আওয়াজ দেবার শক্তিটুকুও বাকি ছিল না।

"বহুক্ষণ বাদে, অনেক খোঁজাখুঁজির শেষে আমাদের গ্রামের কয়েকজন কৃষাণ মশাল হাতে আমাদের কাছে এসে পৌঁছুল।একটা কম্বলে জড়িয়ে তারা আমায় ধরাধরি করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এল। মা আর বোন আমায় দেখে যেন বোবা হয়ে গেছিল। একটা শব্দও ছিল না তাদের মুখে। কিন্তু খানিক বাদে বাবার দেহটা এসে পৌঁছোতে তারা কান্নায় ভেঙে পড়লো।

“খানিক বাদে আমি কোনমতে আমার বোনকে ডেকে বললাম, ‘মাকে ডাক। আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না।’

“বোন কাঁদতে কাঁদতে বলে, ‘না না দাদা। তুমি মরবে না। কিছুতেই মরবে না। নাপিতের বাড়ি খবর গেছে। সে এসে গুলিটা বের করে দিলেই তুমি ঠিক হয়ে যাবে দেখো!’

“বাড়িতে তখন সারা গ্রাম এসে ভেঙে পড়েছে। হঠাৎ ভিড় সরিয়ে আমাদের কাজিসাহেব এসে দাঁড়ালেন। বাবার দেহটার দিকে একঝলক দেখে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কাকে সন্দেহ হয় তোমার? তাড়াতাড়ি বলো বাবা। খুনিরা আমরা পালাতে দেবো না।’

“আমি ফিসফিস করে বললাম, ‘এটার-এর প্যাটেল মধুর কাছ থেকে ঘোড়া নিয়ে খুনীরা পালিয়ে গেছে। তাড়া করে কোন লাভ হবে না।’

“ ‘কার থেকে ঘোড়া নিয়েছে? কী নাম বললে? কষ্ট করে যতটা পারো খুলে বলো বাবা।’

“আমি কোনমতে যতটা পারি খুলে বললাম ঘটনাটা। শুনে পাশে দাঁড়ানো একজন বলে, ‘এটা মধু প্যাটেলেরই কাজ। আজ রাতের মধ্যে ব্যাটার গোটা গ্রামটা পুড়িয়ে শেষ করে দেবো।’

“ ‘উঁহু। আমার মনে হয় এর পেছনে রহিম খানের হাত আছে,’ আরেকজন মন্তব্য করল।

“রহিম খান সম্পর্কে আমার মামা হতেন। বাবার সঙ্গে তাঁর ভীষণ ঝগড়া ছিল।

“মা কাঁদতে কাঁদতেও হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললেন, ‘কে রে , আমার ভাইয়ের নাম নেয়? আমার ভাই খুনী? জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব রে!’

“তখন চারদিকে খুব একটা তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যেতে আমি আর থাকতে না পেরে শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে চেঁচিয়ে উঠলাম, ‘চুপ করুন আপনারা। এর পেছনে কার হাত আছে আমি জানি। মধু একটা কাপুরুষ। ওর নিজের এ কাজ করবার সাহস হবে না। আর রহিম খান যতই বাবার শত্রু হোক এমন ভয়ানক কাজ সে করতে পারে না। এ কাজ হল দেওয়ান ব্রিজলালের।’

“অমনি দেখি মা ভিড় সরিয়ে আমার দিকে আসতে আসতে বলছেন, ‘কার গলা রে? আমার ছেলেটা না? তুই বেঁচে আছিস? হতচ্ছাড়া কাপুরুষ, বাপকে মেরে ফেললো, তাকে রক্ষা করতে পারলি না , নিজে বেঁচে ফিরে এলি কোন লজ্জায়?’

“তারপর কাছে এসে আমার গায়ের গুলির গর্ত আর রক্ত দেখে ফের হাউমাউ করে কেঁদে বলেন, ‘না না, ভুল বলেছিলাম রে। আমার ছেলে কাপুরুষ নয়। বাপকে বাঁচাতে গিয়ে গুলি খেয়েছিস। তুই আমার বীর ছেলে বাবা। এ সবই আল্লার লীলা। কিন্তু, হায় আল্লা, কী পাপ করেছি যে আমার বর আর ছেলে দুজনকেই এভাবে--’ বলতে বলতে মা ফের বাবার শরীরের কাছে ফিরে গেলেন।

“ওদিকে ব্রিজলালের নাম শুনেই গ্রামের লোকজন একে একে সরে পড়ল। ব্রিজলালের মত লোককে সবাই ভয় পায়। তার বিরুদ্ধে কথা বলবে এমন সাহস তাদের নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের উঠোন সাফ হয়ে গেল। রইলাম শুধু আমরা বাড়ির কজন।

“খানিক বাদে নাপিত এসে পৌঁছোল পাশের গ্রাম থেকে। তারপর শন্না দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সে আমার গায়ের গুলি বের করে দিয়ে খানিকটা আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল আমায়।

****

“সেরে উঠেও আমার বুকের ভেতর প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। কিন্তু ব্রিজলালের মত শক্তিশালী লোকের সঙ্গে আমার মত একটা সাধারণ মানুষে কী-ই বা আর করবে! রাগ আর দুঃখটা কোনমতে হজম করে ফের স্বাভাবিক জীবন শুরু করার চেষ্টা করা ছাড়া আমাদের আর

কোন রাস্তা ছিল না। কাজেই আমরাও সেই চেষ্টাই করতে লাগলাম। বাবার মৃত্যুর পরে আমাকেই সবাই প্যাটেল বলে মেনে নিয়েছিল গ্রামে। মোটামুটি সামলেসুমলে উঠছিলাম আমি। বোনেরও বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম পাশের গ্রামে।

"কিন্তু ব্রিজলাল শুধু বাবাকে মেরেই যে সন্তুষ্ট হয়নি সেটা বোঝা গেল বছরখানেক বাদে। হঠাৎ একদিন ব্রিজলালের কাছ থেকে একটা লোক, কাগজপত্র আর বেশ কিছু সেপাই নিয়ে এসে বলে, সে-ই গ্রামের আসল প্যাটেল। সেপাই দেখে গ্রামের লোক ভয়ে কোন প্রতিবাদ করলো না। নতুন প্যাটেল আমার সব জমিজায়গা কেড়ে নিয়ে আমায় পথে বের করে দিল।

"আমি তখন, মাকে বোনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে পথে বের হলাম। এর আগে আমি কখনো আমার বাবা-ঠাকুর্দার ঠগি ব্যবসায় ঢুকবো বলে ভাবিনি। কিন্তু তখন আমার সামনে বাঁচবার ওই একটা রাস্তাই খোলা ছিলো। আমি এই ঠগির দলে ভিড়ে গেলাম।

"তারপর এই দলের সঙ্গেই সুখে-দুঃখে এতগুলো বছর কেটে গেল। মা মারা গিয়েছেন। বোন শ্বশুরবাড়িতে ভালো আছে। মাঝে মাঝে যাই, আদরযত্ন করে। আমি যে ঠগি সে কথা আমি তাকে বলিনি। সে জানে আমি হোলকার রাজার কাছে সেপাইগিরি করি। মনের মধ্যে একটাই শুধু ইচ্ছে নিয়ে এতগুলো বছর বেঁচেছি। সেটা হল, ব্রিজলালের ওপর বদলা। আজ সে ইচ্ছে পূরণ হয়ে গেছে। জীবনে আর কোন সাধ আহ্লাদ আমার বাকি রইলো না।"

মহম্মদের গল্প শুনে দলের সবারই খুব দুঃখ হয়েছিলো, কিন্তু আমি এর মধ্যে ঈশ্বরের হাত দেখতে পেলাম। একমাত্র ঠগি না হয়ে গেলে মহম্মদ কোনদিনই ব্রিজলালের নাগাল পেত না। সবই ভবানীর দয়া।

সেদিন থেকে আমি ঠিক করে নিলাম এইবারে আমাকে একজন ভালো ঠগি হয়ে উঠতে হবে। আমাদের হুসেনের দলে রূপ সিং নামে একজন রাজপুত ঠগি ছিল।তার ডাকনাম গুরু। গুরুর তখন বয়স হয়েছে, কিন্তু চেহারা দেখলে বোঝা যায় এককালে তার গায়ে খুব শক্তি ছিল। রুমাল চালানোয় গুরুর দক্ষতার ব্যাপারে অবিশ্বাস্য সব গল্প চলতো ঠগি নহলে। বাবাকে গিয়ে আমি ধরলাম, গুরুর কাছে কাজ শিখবো। শুনে বাবা বেজায় খুশি হয়ে আমায় হুসেনের দলে নিয়ে গিয়ে রূপ সিং-এর জিম্মা করে দিয়ে বলে গেল, "এইবারে ক'দিন এখানে তালিম নে। এর পরের শিকারের সময় হাতে কাজ করে দেখাতে হবে তোকে।"

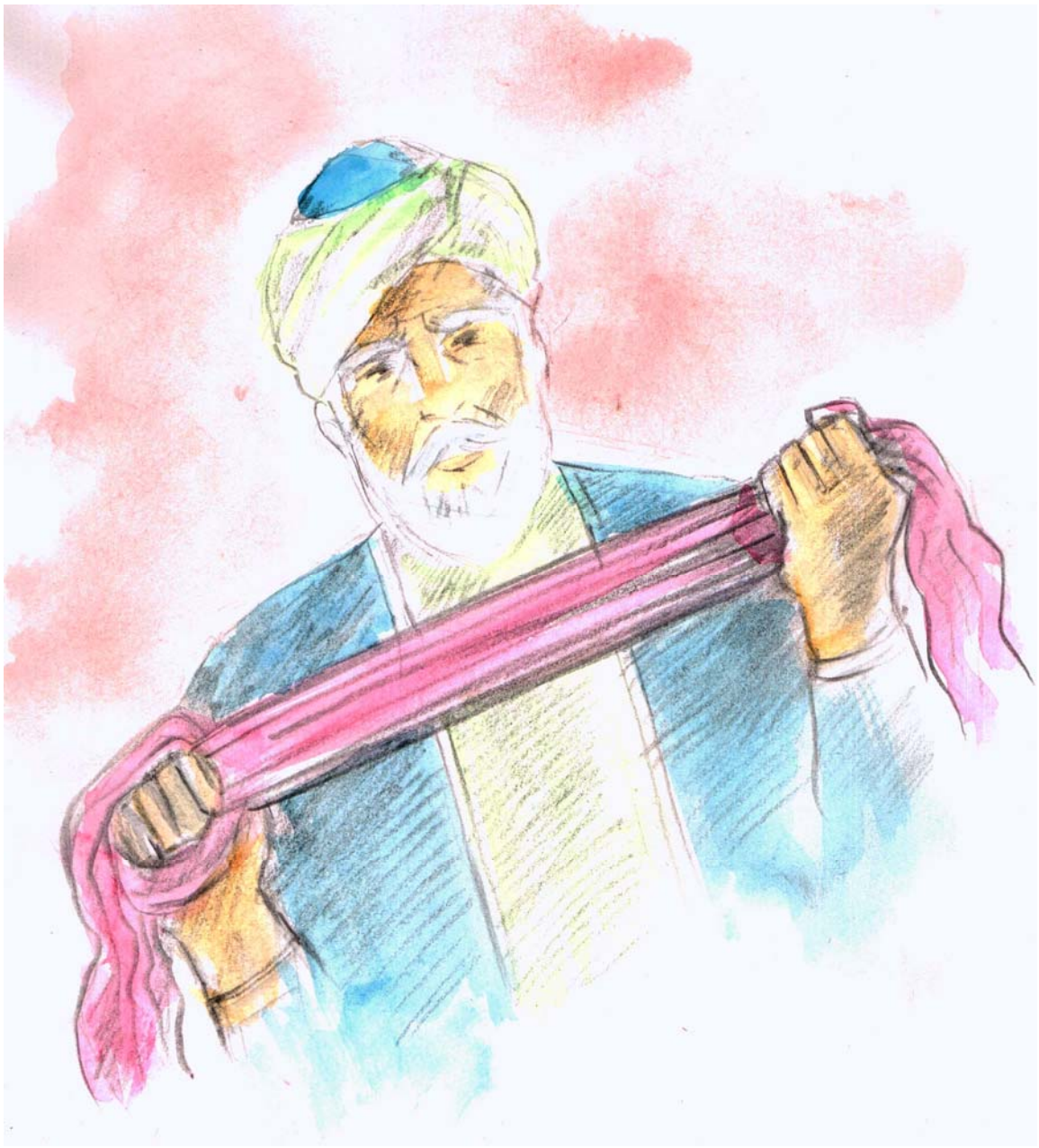

পরদিন থেকে তালিম শুরু হল আমার। রূপ সিং আমার জন্য অনেক পুজোপাঠ করল। চারদিন ধরে আমি শুধু দুধ খেয়ে থেকে ব্রত পালন করলাম। ওতে নাকি ঠগির মন শক্ত হয় , ভাগ্য সদয় হয়। পাঁচদিনের দিন স্নান করে ভবানীর পুজো করে কপালে সিঁদুরের টিপ পড়লাম আমি। তারপর আমার হাতে রুমাল দিয়ে আমায় 'ভুত্তোট' বলে ঘোষণা করা হল।

হঠাৎ মুচকি হেসে রূপ সিং বলে, "আরে, একটা ব্যাপার তো ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমায় তো রুমাল চালাবার কায়দাটাই দেখানো হয় নি হে! আমারই ভুল। এসো দেখাই। সোজা কায়দা। শিখতে সময় নেবে না বেশি।"

এই বলে রুমালটা হাতে নিয়ে সে তার একপাশে একটা রুপোর টাকা ঢুকিয়ে দিয়ে বড় একটা গিঁট বাঁধলো। তারপর সে দিকটা বাঁহাতে আর রুমালের অন্য দিকটা ডান হাতে ধরে হাতদুটো ফাঁক করে ধরলো। দেখা গেলো দু হাতের মধ্যে রুমালের যতটা রয়েছে তাতে একটা মানুষের গলাটা ঘিরে নেয়া যায়।

"ভালো করে শোন। পেছন থেকে রুমালটা গলার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সেটাকে প্যাঁচ মেরে রূপোর টাকাটা ঠিক ঘাড়ের ওপর এনে ঠেকিয়ে হাতের একটা মোচড় দেবে—এই ভাবে—ব্যস। এক মোচড়েই শেষ। কোন ঝটাপটি হবেনা। এটা আমার একেবারে নিজের কায়দা, বুঝলে! এসো , গলাটা এগোও, দেখিয়ে দিই--"

তার ঠাণ্ডা, শক্ত হাতদুটো আমার গলার ওপর রুমাল পেঁচিয়ে ধরে শক্ত হয়ে এলো। বুকের ভেতরটা কাঁপছিলো আমার। যদি একটু শক্ত হয়ে বসে হাতগুলো—

গুরু কিন্তু আমায় একটুও ব্যথা দিলো না। শুধু হাতের মৃদু চাপে ঠিকঠাক অবস্থানগুলো বুঝিয়ে দিতে লাগলো।

দিনকয়েক অভ্যাস করে কায়দাটা বেশ রপ্ত হয়ে এলো আমার। রূপ সিং খুশি হয়ে বলল, "এইবারে ময়দানে নেমে কাজ শুরু করে দাও দেখি আমির আলি! হাতেকলমে যত কাজ করবে ততই হাত আরো ভালো হবে দেখো।"

আমি রুমাল নিয়ে বাবার কাছে ফিরে এলাম।

ক্রমশ

ছবি মৌসুমী

নোলেদা

নোলেদারই জয়গান চারিদিকে। দেখতে সোজাসাপটা বাঙালি ছেলেদের মত হলেও নোলেদা যা পারে তা দেশ-বিদেশের নামিদামি লোকজনেরাও পারে না। কখনও ক্রিকেট খেলায় একটা ড্রাইভ মেরেই ১০৮ রান করে ফেলে, কখনও ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে আকাশের তারা হয়ে যায়, কখনো হাতে হেঁটে হেঁটে এমন ফুটবল খেলে ফেলে যে স্বয়ং পেলেও হাঁ হয়ে যান, কখনো ল্যাবরেটরিতে এমন সার তৈরি করে বসে যা দিলে বাঁধাকপি এত বড় হয়ে যায় যে তার ভারে ঘরবাড়ি ভেঙে যায় - এই হচ্ছে নোলেদা। দুনিয়ায় তাকে প্রায় সবাই চেনে। দেশবিদেশ থেকে বিশেষ কাজের জন্য তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। একবার তো পশ্চিম জার্মানি ও হল্যান্ডের ফুটবল ম্যাচে জার্মান খেলোয়াড় বেকেনবাউয়ার-এর ছদ্মবেশে এমন খেলল যে জার্মানি হই হই করে জিতে গেল।

নোলেদার কান্ড-কারখানা নিয়েই অহিভূষণ মালিকের ছবির বই "নোলেদা"। পাতা জুড়ে রঙিন ছবি সব। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। আর পড়লে না হেসে পারা যায় না। ছোট ছোট গল্প, প্রত্যেকটাই ভীষণ মজার। আমার নিজের সবচেয়ে প্রিয় গল্প অবশ্য নোলেদার শিল্পপ্রদর্শনী। আর নোলেদার ফুটবল ম্যাচের গল্পগুলোও বেশ মজার।

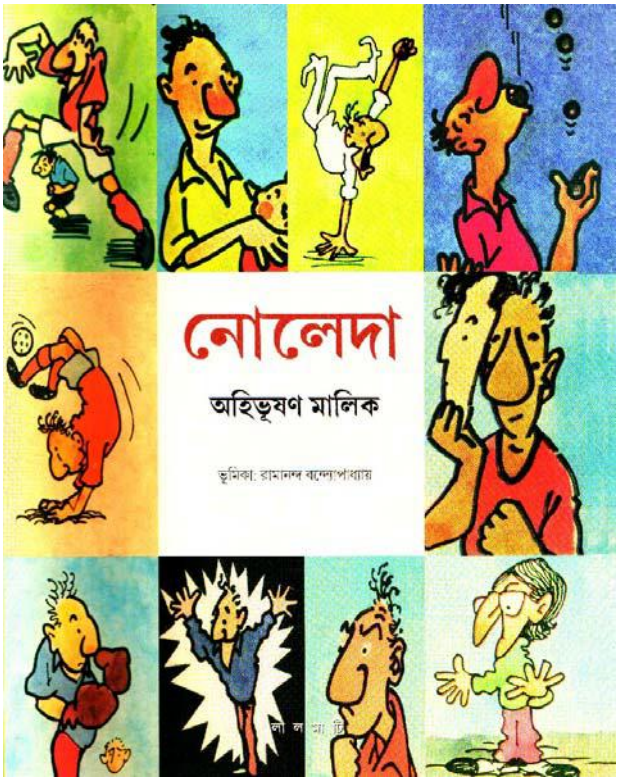

এই বর্ষায় বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে শুনতে, হাতে মুড়ি-মাখার বাটি নিয়ে নোলেদা পড়ার মজাই আলাদা। অতএব, দেরি না করে বইটা জোগাড় করে নিয়ে পড়ে ফেল। পড়ে কেমন লাগল সেটা জয়ঢাককে জানিও।

বই —নোলেদা
লেখা ও ছবি — অহিভূষণ মালিক
প্রকাশনী —লালমাটি
দাম -৮০ টাকা

মহাশ্বেতা

সে অনেককাল আগের কথা। দূর পাহাড়ের মাথায় ছিল দুখানা পুকুর। তারা জঙ্গলের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় পাশাপাশি বসে থাকত। তাদের নাম ছিল লাই ও আম্বাম। কিন্তু জন্ম থেকে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও স্বভাবে ছিল তারা এক্কেবারে আলাদা। লাই ছিল অগভীর ও ছড়ানো। সে ছিল এতটাই চঞ্চল যে একটু হাওয়া বইলেই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠত। কথায় কথায় সে নিজের জায়গা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আশেপাশের ইঁদুরের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ত অথবা সাপগুলোকে এমন তাড়া করত যে তারা আর কিছু না করতে পেরে তরতর করে গাছ বেয়ে উঠে পড়ত। জঙ্গলের কোন জন্তু পারতপক্ষে লাই-এর কাছাকাছি আসতে চাইত না। খুব বিপাকে পড়ে যদিও বা কেউ লাই-এর জল ব্যবহার করবার চেষ্টা করত, তাতে মুখ ডোবানো মাত্র লাই এমন লাফিয়ে উঠত, যে ভিজে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে বেচারার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াত।

লাই যতটা দুর্দান্ত, তার ভাই আম্বাম ছিল ঠিক ততটাই শান্ত। জঙ্গলের জন্তুরাও তাই তার ঠাণ্ডা টলটলে জলে আরাম করে স্নান করতে ভালবাসত। তারা আম্বামের গভীর জলে মুখ ডুবিয়ে জল খেত প্রাণ ভরে।

রাতে যখন চাঁদ উঠত, তখন লাইয়ের গায়ে তার ভাঙা টুকরো টুকরো ছায়াটা দেখা যেত। কিন্তু আম্বামের শান্ত শরীরে তার স্থির, নিটোল মুখটা দেখা যেত, ঠিক যেন আয়নার মত। জঙ্গলের সমস্ত গুজব লাইয়ের থাকত মুখস্ত। সে হাত পা নাড়িয়ে, হেসে কুটিপাটি হয়ে সেসব রসালো গল্পের আলোচনা করত সারাদিন। কিন্তু শান্ত আম্বাম সেসবের বিশেষ ধার ধারতো না। সে নিজের মতো সময় কাটাতেই বেশি পছন্দ করত। এইরকম দুই একেবারে আলাদা চরিত্রের পুকুর যে কী করে এতদিন একসঙ্গে কাটালো, আর পাহাড়ের দেবতারা যে কেনই বা তাদের ওরকম একসাথে রাখল, তা এক রহস্যময় ব্যাপার।

লাই ও আম্বাম সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে বেশ হেসে খেলেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল। তাদের ওইরকম শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন যে একদিন পুরোপুরি পালটে যাবে, তা তারা ঘুণাক্ষরেও জানতো না। তারপর এল সেই গ্রীষ্মের দুপুরবেলা। লাইয়ের সেদিন সকাল থেকেই খুব অস্থির লাগছিল। কিছু একটা না করলে যেন তার আর সইবে না এ'রকম অবস্থা। কিন্তু তার কপাল এমন খারাপ যে করবার জন্য কোন কাজও জুটছিল না সেদিন। আশপাশের গর্তগুলো থেকে সব ইঁদুর পালিয়ে গেছে লাইয়ের উপদ্রব সহ্য না করতে পেরে। জ্বালানোর জন্য সাপখোপও কিছু দেখা যাচ্ছিল না। শেষমেষ বিরক্ত হয়ে লাই এমন নড়ে-চড়ে উঠল যে তার মধ্যে থাকা সব জলজ উদ্ভিদও ভয় পেয়ে গেল। শেষে আর থাকতে না পেরে সে আম্বামের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠল, "এই আম্বাম! আজ এত চুপচাপ যে? তোর মত ভ্যাবলা আমি কিন্তু জীবনে দেখিনি! দিনের পর দিন কিছু না বলে থাকিস কী করে বল তো?"

আম্বাম কিন্তু রাগল না। সে স্বভাবতই এত ঠাণ্ডা যে তাকে হাজার টিটকিরি দিলেও সে কিছু মনে করে না। তাছাড়া লাইকে সে জন্ম থেকে দেখে আসছে, সবার সাথেই ওরকম ভাবেই কথা বলে ও। শান্ত গলায় আম্বাম তাই উত্তর দিল, "কিছু না ভাই। আমার এই গাছেদের ফিসফিসানি, পাখিদের গান শুনেই দিব্যি দিন কেটে যায়। তোমার মত অত লাফঝাঁপ করতে আমার ভাল লাগে না।"

লাই তখন তাকে ব্যঙ্গ করে বলল, "গাছেদের ফিসফিসানি, পাখিদের গান —আহা দেখো আম্বাম আমাদের কবি হয়েছেন! সত্যি বাপু, তুই ঢঙ করতে পারিস বটে। যাহোক, যা বলছিলাম, আজকে আমার বড় অস্থির লাগছে বুঝলি? ওই ইঁদুরগুলো চলে যাওয়ার পর থেকে এই জায়গাটা খুব শান্ত হয়ে গেছে। চল না দু'জন মিলে গিয়ে কটা গাছ-টাছ উপড়ে আসি? খুব মজা হবে।"

আম্বাম হালকা হেসে জবাব দিল, "কেন ভাই? গাছ উপড়াতে যাবো কেন? তার চেয়ে বরং এখানে শুয়ে আকাশের মেঘ দেখি। আজকের আকাশটা কি নীল দেখেছিস?"

“আকাশ? নীল? বাব্বা!” এই বলে লাই এমন হাসতে লাগল যে তার বুকে একটা বিশাল ঘুর্ণী তৈরি হয়ে গেল। সেই ঘুর্ণী থামিয়ে শান্ত হতে লাইয়ের বেশ কিছুক্ষণ লাগল। তারপর কেশে-টেশে নিয়ে সে বলল, “তার চেয়ে চল একটা দৌড় প্রতিযোগিতা করি। আমরা নাহয় সেপিক নদী অবধি যাব। তারপর সেখান থেকে সমুদ্রেও চলে যেতে পারি। কী বলিস?”

পাখিদের কাছে আম্বাম সেপিক নদীর ব্যাপারে অনেক কিছু শুনেছে। সেপিক বিশাল, খরস্রোতা নদী। উত্তরের উঁচু পাহাড় থেকে নেমে এসে সেপিক প্রায় হাজার হাজার মাইল দূরের সমুদ্রে গিয়ে মেশে। আম্বাম বিশাল সব জলাভূমির গল্প শুনেছে, যার ভেতর দিয়ে সেপিক বয়ে যায়। পাহাড়ের মধ্যে গভীর সব খাদের গল্প শুনেছে যেখানে এক এক জায়গায় সেপিকের জল সাদা হয়ে ফুটতে থাকে। সমতলের সেপিকের দুইধারে গড়ে ওঠা বসতি ও অদ্ভুত সব মানুষ, তাদের তৈরি করা উঁচু উঁচু কাঠের মন্দির, আর সমুদ্রের ধারে থাকা আদিবাসীদের বানানো লম্বা লম্বা নৌকোর গল্পও পাখিরা তাকে শুনিয়েছে। হঠাৎ তার ভিতর থেকে জেগে উঠল একটা অদম্য ইচ্ছা। লাইয়ের প্রস্তাব মেনে নিলেই তো হয়। সেপিকে গিয়ে মিশে যদি সত্যি সত্যিই সমুদ্রে গিয়ে মেশা যায়? যেসব জিনিসের সে এতদিন গল্প শুনে এসেছে, সেগুলোকে নিজের চোখে দেখতে পাবে সে। তার মনটা কেমন আনচান করে উঠল। সে চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিল। জঙ্গলের মধ্যিখানের এই জায়গাটাতেই সে জন্ম ইস্তক থেকেছে। তার ধারে সারিসারি গাছের পিছনে নীলচে পাহাড়ের সারি দেখা যায়। এই জায়গাটাকেই তো সে জন্ম ইস্তক বাড়ি বলে জেনে এসেছে। কিন্তু নদী হয়ে গেলেও বাড়ি ছেড়ে একদম তো সে চলে যাচ্ছে না। তার একটা অংশ তো এখানেই থেকে যাবে।

“বেশ! আমি আসবো। কিন্তু দৌড় প্রতিযোগিতা করতে হবে না। এমনিতেই তোমার সাথে দৌড়ে আমি পারবো না। তাছাড়া পাহাড় থেকে দৌড়ে নামতে গেলে আমরা যে কতকিছু তছনছ করে দিয়ে যাব তার কোন ইয়ত্তা থাকবে না। তার থেকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে সাবধানে নামব। তাতে মানুষের বানানো সুন্দর বাগানগুলোও নষ্ট হবে না, জন্তুদের বাড়িঘরও ভাঙবে না।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ! বুঝেছি বাবা! তাই করব।” লাই গজগজ করল কিছুক্ষণ। তার আসলে সঙ্গে যাওয়ার জন্য একজন সাথীর দরকার ছিল, যাকে সে তার ছলাকলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। আর আম্বাম ছাড়া সেই মুহূর্তে আর কাউকে জোগাড় করতে না পেরে, আর কোন উপায় না দেখে তাকে সে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল। এমনিতে আম্বামের ওই শান্ত শান্ত ভাব তার মোটেই পছন্দ ছিল না।

“চল তাহলে, রওনা দিই!” এই বলে লাই প্রথম তার তট থেকে উপচে বেড়োল, তারপর পাহাড়ের গা গড়িয়ে নামতে লাগল।

“দাঁড়াও ভাই! অত তাড়াহুড়ো কর না,” আম্বাম বলে উঠল, “আমরা তো এখনো কোন রাস্তা ধরে যাবো সেটাই ভেবে উঠতে পারিনি। আজ রাতটা নাহয় কোথা দিয়ে যাবো সেটা ভেবে নিই, তারপর কাল রওনা দেব।”

“আচ্ছা! আচ্ছা! দাঁড়াচ্ছি,” বলে লাই কোনরকমে গুটিয়ে গুটিয়ে আবার তার খোপে ফিরে এল। তারপর রেগেমেগে বলল, “সত্যি আম্বাম। তুই পারিসও বটে। এতই যদি আলস্য, তাহলে রাজি হলি কেন?”

সে রাতে আম্বাম তারার দিকে তাকিয়ে যখন রাস্তার চিন্তা করছে, তখন লাই হয়ে উঠল ভীষণ অস্থির। মনে মনে সে অনেক কথাই ভাবতে লাগল। সে, যে কিনা নদী হতে চলেছে, সে রাখবে বাগান আর ইঁদুরের গর্তের খেয়াল? তাছাড়া নদী হতে গেলে কটা ইঁদুর ডুবলে ক্ষতি কী? আম্বামও পারে বটে! ওর যেন সবতাতেই বেশি বেশি।

শেষে আর সহ্য করতে না পেরে লাই ঠিক করল আম্বামকে ফেলেই সেপিকে চলে যাবে সে। শান্ত আম্বাম তারা দেখতে দেখতে সেপিকের কথা ভেবে চলেছিল। তার দিকে এক ঝলক দেখে নিল সে। তারপর এক পা এক পা করে তার খোপ থেকে বেড়িয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ের গা ধরে নামতে লাগল। তার দীঘল শরীরে চাঁদের রুপোলি ছায়া পড়ে চকমক করতে লাগল, কিন্তু আম্বাম তার কিছুই জানতে পারল না। বেশ অনেকটা নেমে গিয়ে লাই কিছুক্ষণের জন্য থামল। তারপর নিজের মনেই একটু হাসল, “সূর্য উঠলে আম্বামটা যা চমকাবে না! হা! হা! রাস্তার চিন্তা! বেশ হয়েছে। আসুক ও ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। আমার বাবা ওর মত অত বাছবিচার নেই। আমি আমার মত সোজাসুজি চলে যাই। ও আসুক কষ্ট করে!”

লাই তারপরে শরীরের সমস্ত শক্তি জোগাড় করে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ালো, কয়েক মুহূর্ত নিজের এই নতুন পাওয়া শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে থেকে সে একটা উদ্দাম ঝাঁপ দিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে পথের সবকিছুকে ধ্বংস করতে করতে নামতে লাগল। প্রথমে গাছপালা, গুহা, তারপরে একটা গ্রাম। খড়-বাঁশ-কাঠের দুর্বল বাড়িঘরগুলো অনায়াসেই সে ভেঙে তছনছ করে দিল। একটা বিরাট রাক্ষসের মতো সে তার ধ্বংসলীলা চালাতে লাগল। ছেলে-বুড়োর দল প্রাণ বাঁচাতে এদিক ওদিক দৌড়ে পালাতে লাগল। লাই ছুটে ছুটে নামতে লাগল। কুকুর, শুয়োর আর অন্য জন্তুদের উলটে ফেলল, পাথরগুলোকে এদিক ওদিক ছুঁড়তে লাগল, গাছের পর গাছ উপড়ে ফেলল আর তার জলের হাত ঢুকিয়ে দিতে লাগল ইঁদুরের গর্তের মধ্যে। এসবে সে এত আনন্দ পেল যে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

সে রাতে আরও দু'খানা গ্রাম লাই ধ্বংস করল। এমন হঠাৎ করে ভীষণ জোরে ধেয়ে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো যে, গ্রামের মানুষেরা চিৎকার করে একে অন্যকে সাবধান করার আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিলো গ্রামগুলো। পালিয়ে অনেকে প্রাণ বাঁচাল বটে কিন্তু বাড়িঘর, ক্ষেত-খামার খুইয়ে তাদের অবস্থা হয়ে দাঁড়াল শোচনীয়। লাই হাসতে হাসতে দেখল কীভাবে মানুষ তার ধ্বংসলীলা এড়াতে গাছে চড়ে বসছে, নয়তো ডাইনে-বাঁয়ে ছুটে পালাচ্ছে। রাতের

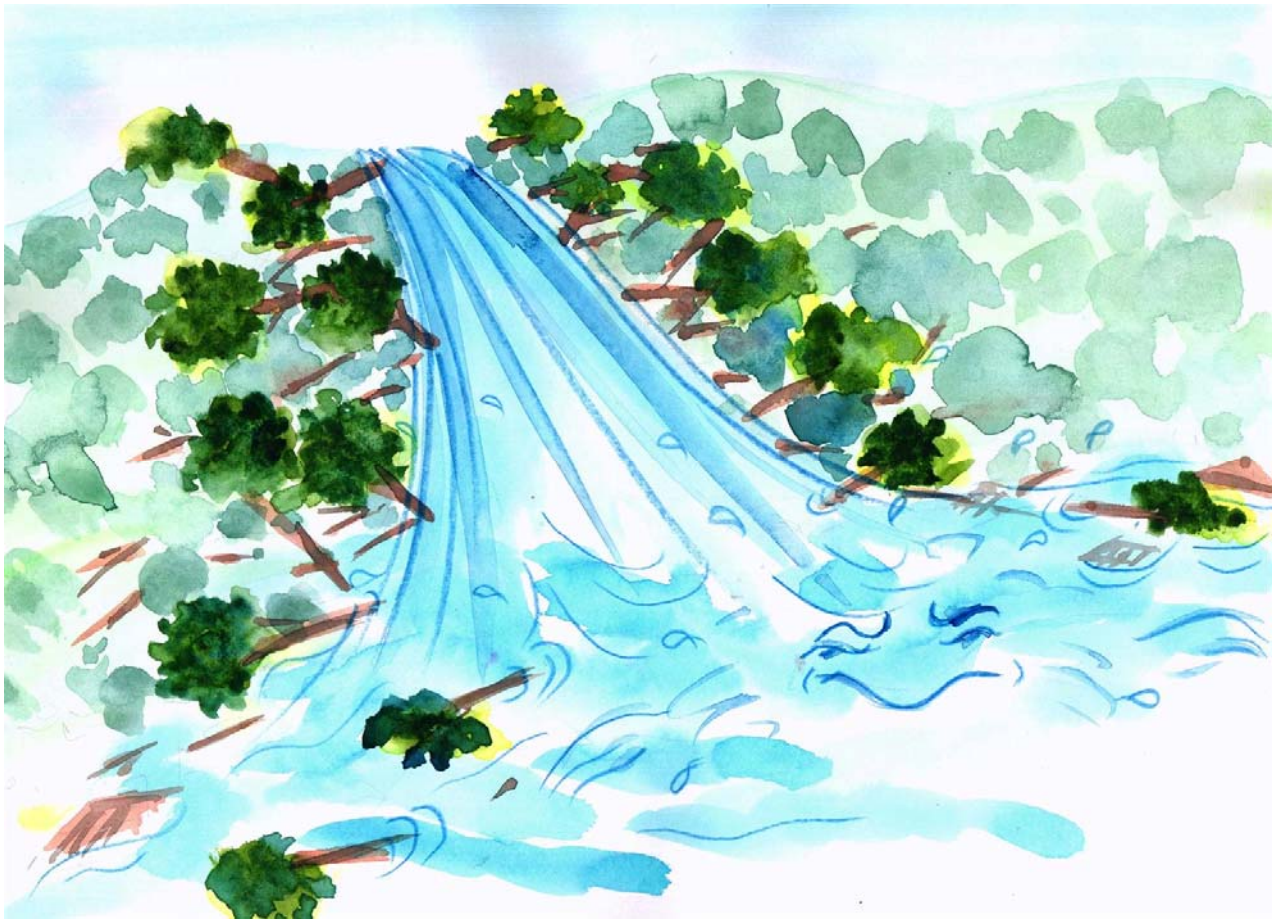

অন্ধকারে সে যেন ভূমিকম্পের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিল।

লাইয়ের তো তখন আনন্দের শেষ নেই। এই তো জীবন! পাহাড়ের ওপর পুকুর হয়ে শুয়ে থাকাতে কোন আনন্দ আছে? এতদিনে লাই মুক্তি পেয়েছে। এখন সে লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে, দৌড়ে, ছুটে বেড়াবে! এত আনন্দ বোধহয় তার জীবনে কখনো হয়নি! তার গায়ে কলা, ভুট্টা, বাদাম, গাছপালা, ঘর-বাড়ি — আরও কত কি বয়ে চলছিল। মানুষদের এত সাধের বাগানগুলোকেও সে নষ্ট করে দিল। তার ভয়ে দলে দলে পাখি গাছের মাথা থেকে উড়ে পালাতে লাগল।

সকাল হতে লাই সেপিক নদীকে প্রথম দেখতে পেল। অনেক নীচ দিয়ে সে রাজকীয় ভাবে বয়ে যাচ্ছিল। আর দেরি নেই, এই ভেবে সে আরও শক্তি নিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগল। সেপিকের পাড়ে গাছগুলোকে একরকম ভেঙে লাই এসে সেপিকের সাথে জুড়ল। রাতের ছুটোছুটির পর বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। তাই বেশ কিছুক্ষণ হাঁপিয়ে নিল সে। কি মজা! কি আনন্দ! অবশেষে সেপিকের সাথে সে জুড়েছে। এই তো সেদিন পাহাড়ের মাথায় পুকুর হয়ে ছিল সে। ভাবা যায়? এক রাতেই কতটা দূরে চলে এসেছে সে? কিন্তু আম্বামটা তো ওখানেই পড়ে রইল। বেশ হয়েছে! আসুক ও এবার আস্তে আস্তে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। তিন দিনের কমে যে পৌঁছোবে না তা তো জানা কথা। ততদিনে হয়তো ও সমুদ্রও দেখে ফেলবে। কিন্তু ঝকঝকে, চঞ্চল লাইয়ের সাথে মন্থর, নিষ্প্রভ আম্বামের তুলনা করেন যদি সেপিক মহারাজ? না না! তা হতে পারে না! কোথায় সে আর কোথায় বোকা আম্বাম।

অনেক দূরে পাহাড়ের মাথায় আম্বাম ততক্ষণে কোন রাস্তা দিয়ে যাবে সেটা ভেবে নিয়েছে। এবার শুধু রওনা দিলেই হল। তারা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, ধীরে ধীরে গাছের গা ধরে ধরে যাবে। গ্রাম দেখলেই তার পাশ কাটিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাবে। এমন সব জায়গা দিয়ে যাবে যেখানে জন্তুদের বাসা নেই, আর গাছও বেশি গজায় না। এমন ভাবে যাবে যাতে কারও ক্ষতি না হয়। হয়ত গোটা দিনটাই লেগে যাবে তাদের পৌঁছোতে পৌঁছোতে। কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা হবে না।

বেশ কিছুক্ষণ লাইয়ের ওধার থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনটা কখনও হয়না। লাই খুবই মুখর। চুপ করে বসতেই পারে না একদম। আম্বাম বলে উঠল, "রাস্তা একটা ঠিক করেছি লাই। শুনবে?"

কোন উত্তর নেই। আম্বাম আবার জিজ্ঞেস করল, "কি লাই? কিছু বলবে না?"

লাইয়ের কাছ থেকে যখন এবারও আম্বাম কোন জবাব পেল না তখন সে মুখ ঘোরালো। কিন্তু লাইয়ের দিকে চাইতে দেখে, কোথায় লাই, কোথায় কী! সব ফাঁকা। তার বদলে লাইয়ের জায়গাটা থেকে একটা লম্বা জলের ধারা নেমে গেছে পাহাড় বেয়ে, তার পাড় ধরে শয়ে শয়ে ওপড়ানো গাছ পড়ে রয়েছে। অনেক নিচে একটা গ্রামের ধ্বংসস্তুপ পড়ে ছিল। একটা ঘরও আস্ত ছিল না সেখানে। রাতারাতি কে যেন নিঃশেষ করে দিয়েছে গ্রামটাকে।

"লাই পালিয়েছে! লাই পালিয়েছে! কি মজা! কি মজা!", গাছের ডাল থেকে একটা পাখি গেয়ে উঠল।

আম্বাম শান্তভাবে তার জায়গা থেকে বের হল। তারপর আস্তে আস্তে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। সে প্রথমে লাইয়ের পথ ধরেই গেল। সেই পথের দুধারেই ধ্বংসের ছাপ। লাই যে কত গাছ উপড়েছে তা আর গুনে শেষ করা যায় না। নামতে নামতে আম্বাম প্রথম গ্রামটার ভগ্নস্তুপে এসে পৌঁছুল। নিশ্চুপ হয়ে সব মানুষজন জড় হয়েছিল। বাচ্চারা এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে কাদা থেকে জিনিসপত্র উদ্ধার করছিল- একটা কাপড়ের পুতুল, একটা ছেঁড়া মাদুর। মড়া জন্তু-জানোয়ারের শরীর এদিক ওদিক পড়ে ছিল। পাশ দিয়ে আম্বামকে বয়ে যেতে দেখে গ্রামের মানুষরা তাকে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল।

গ্রামটা পেরিয়ে আম্বাম একটু থামল। সে বেশ বুঝছিল যে লাই তাকে বোকা বানিয়ে পালিয়েছে। আর শুধু পালায়ই নি, চারিদিকে সবকিছু ধ্বংস করতে করতে পালিয়েছে। কিন্তু ওর দেখা কোথায় পাবে আম্বাম? আম্বাম ভেবে দেখল যে সেপিকে মিশতে গেলে লাইকে নিশ্চয় জলা হয়ে যেতে হয়েছে। ঠিক আছে। আম্বাম নিজের রাস্তা দিয়েই যাবে। তারপর জলায় গিয়ে ঢুকে লাইয়ের সাথে একটা বোঝাপড়া করবে সে।

বাকি রাস্তাটা আম্বাম গম্ভীর ভাবেই গেল। সে এমনিতেই গম্ভীর কিন্তু সেদিন রাগে দুঃখে যেন সে আরও বেশি গম্ভীর হয়ে গেছিল। সে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে, কাউকে বিরক্ত না করে, গ্রাম দেখলেই তার পাশ কাটিয়ে চলতে লাগল। লাইয়ের চেয়ে অনেক লম্বা রাস্তা ধরে চলতে হল আম্বামকে, কিন্তু কোন প্রাণীর কোন ক্ষতি করল না সে। সেপিকের ধারের জলায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে তার সন্ধ্যে হয়ে গেল। দূর থেকেই সে লাইকে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু সে এমন আস্তে আস্তে চলছিল যে ঝোপঝাড় ঠেলে না বেড়োন অবধি লাই টেরই পেল না যে সে আসছে। কিন্তু আম্বামকে দেখামাত্র সে হা হা করে হেসে উঠল। তারপর চিৎকার করে বলল, “কি রে! এত দেরি যে? আস্তে আস্তে আসছিলি বুঝি? আরে নদী হবি যদি তাহলে আমার মত হ। উফ! কালকে রাত্রে যা মজা হয়েছে না! তোকে আর কী বলব? তিনতিনটে গ্রাম একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছি। আর লোকগুলোর কি চিৎকার! এখানে আসার আগে একবারও থামিনি। তোর জন্য সকাল থেকে অপেক্ষা করে আছি, বুঝলি?”

আম্বাম ভীষণ রেগে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, “আর মজা করতে গিয়ে কত মানুষের ক্ষতি করেছো সে খেয়াল আছে? আমি আসতে আসতে দেখলাম। সবাই তোমার শাপশাপান্ত করছিল জানো? ছি ছি ছি!”

“কারা? ওই মানুষগুলো? তা করতে দে না। ওদের নিয়ে কে মাথা ঘামায়। কি ঠুনকো সব বাড়ি বানিয়েছে। একবার ধাক্কা দিতেই সব ভেসে গেল! ওইরকম বাড়িঘর থাকার চেয়ে না থাকা ভাল । ও বুঝেছি! তোকে হারিয়ে দিয়েছি বলে তোর হিংসা হচ্ছে, তাই না? হা হা! তোর পেটে পেটে কি এই ছিল আম্বাম? হা হা হা!”

আম্বাম সহজে মেজাজ হারায় না, কিন্তু সেদিন সেও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল।

“হিংসা করছি আমি? হিংসা! হায় রে! তোমার মত স্বার্থপর আমি সত্যি কখনও দেখিনি। নিজের ভাবনা ছাড়া কখনো কিছু ভাবো তুমি?”

লাই এবার রেগে উঠল। সে ভয়ঙ্করভাবে হিসহিস করে আম্বামের দিকে গিয়ে আসতে লাগল। তারপর একটা হাত বের করে আম্বামকে দিল এক ঘুসি। দুই নদী একবার একসাথে জুড়ে গেল তারপর আবার দুভাগ হয়ে গেল। তারপর ঠেলাঠেলি মারামারি করতে করতে সেপিকের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ আম্বাম লাইয়ের মাথাটা এমন শক্ত করে ধরে ফেলল যে দুই নদী এক হয়ে সেপিকে গিয়ে পড়ল। তারপর সেপিক বেয়ে তারা সমুদ্রের দিকে ধেয়ে যেতে লাগল।

এখনো যদি তোমরা ওইখানে যাও তোমরা লাই আর আম্বামকে দেখতে পাবে। লাইয়ের সোজা রাস্তা আর আম্বামের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাকা রাস্তা। সেপিকের ধারে এসে এখনও

তারা তাদের পুরোন লড়াইটা লড়ে। একবার এ ওর মধ্যে ঢুকে যায়, আরেকবার ও ঢুকে যায় এর মধ্যে। তারপর এক হয় সেপিকের জলে গিয়ে পড়ে লাই ও আম্বাম। আবার সেপিকের স্রোতে পড়ে তারা ঝগড়া ভুলে সমুদ্রের দিকে বয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু সেই এলাকার অধিবাসীরা কিন্তু ভুলতে পারেনা লাই ও আম্বামের গল্প। কারণ আম্বাম তাদের কোন ক্ষতি না করে দূর থেকে বয়ে গেলেও, লাই এখনো তাদের খুব উৎপাত করে। মাঝে মাঝে রাস্তা বদল করে ভাসিয়ে দেয় গ্রামের পর গ্রাম, উপড়ে দেয় গাছ। তাই গ্রামের লোকে তার শাপশাপান্ত করে বলে, "কিছু কিছু জিনিস কখনো বদলায় না। লাইও ওইরকম একজন, ওর সর্বনাশ হোক!"

পাপুয়া নিউ গিনির লোককথা।
উৎসঃ ক্রিস্টোফার সমারভিল-এর 'সাউথ সি স্টোরিজ'
ছবিঃ মৌসুমী

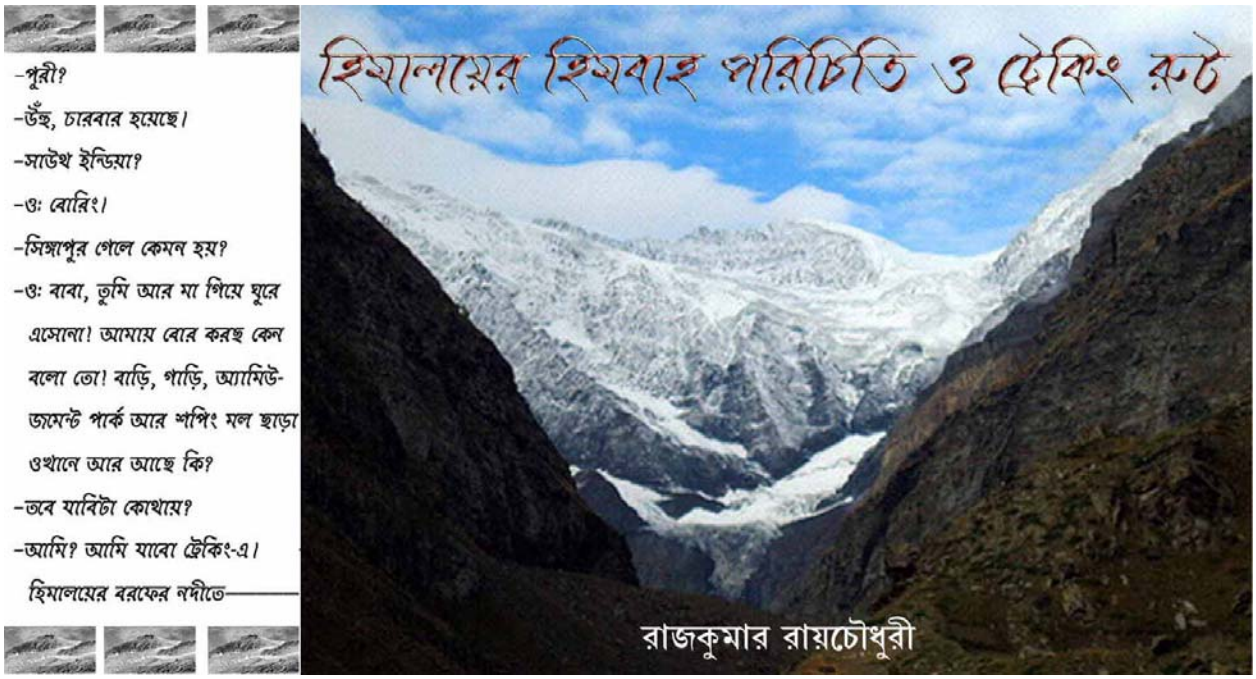

শিলাসমুদ্র হিমবাহঃ-

. রূপকুন্ডের পথ হিমালয় যাত্রীদের কাছে অতি পরিচিত। যাঁরা রূপকুন্ড যাননি তাঁরাও এ পথের বিবরণ কোথাও না কোথাও পড়েছেন। এপথে জিওনারগুলি গিরিপথ অতিক্রম করে শিলাসমুদ্র হিমবাহের মোরেনে পৌঁছন যায়। সৌন্দর্য বিচারে রূপকুন্ড ট্রেকিং রুট হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ ট্রেকিং রুটের অন্যতম।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্প : মান্দোলী

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
কাঠগোদাম - গোয়ালদাম		১৭৫ কিমি	বাস
গোয়ালদাম - মান্দোলী	২১৩৪ মি	১৫ কিমি	জিপ
মান্দোলী - ওয়ান	২৪৩৬ মি	১৫ কিমি	হাঁটা
ওয়ান - বৈদিনি বুগিয়াল	৩৩৫৪ মি	১২ কিমিহাঁটা	
বৈদিনি বুগিয়াল - রুপকুন্ড	৫০২৯ মি	২১ কিমি	হাঁটা
রুপকুন্ড - শিলাসমুদ্র	৩৮১১ মি	৮ কিমি	হাঁটা

কাঠগোদাম থেকে গোয়ালদামে বাসে বা ট্যাক্সিতে আসুন। গোয়ালদামে একরাত কাটান। গোয়ালদাম ভালই লাগবে। পরদিন জিপ ভাড়া করে মান্দোলী পৌঁছন। এখানে থাকার জন্য ট্যুরিস্ট বাংলো আছে। মান্দোলীতে সকাল সকাল পৌঁছলে ওয়ানের জন্য রওনা হতে পারেন। ওয়ান যাবার পথে দুটি সুন্দর হ্রদ পড়বে। বেখাল তাল এবং ব্রহ্ম তাল।

তৃতীয় দিনের গন্তব্যস্থল বৈদিনি ময়দান বা বুগিয়াল। চড়াই উৎরাই এর পথ তবে নীলগঙ্গা নদী পার হবার পর টানা চড়াই। বৈদিনি বুগিয়ালে পৌছে তাঁবু খাটান। দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছলে দেখবেন চেখাম্বা এবং হাতি পর্বতের স্বর্গীয় দৃশ্য। শুধুমাত্র

বৈদিনি বুগুয়ানে এলেও আপনার ট্রেকিং সার্থক হবে। চতুর্থ দিনে ১৬ কিমি এর পথ। ৪ কিমি হাঁটার পর পৌঁছবেন সুন্দর আলি ময়দানে। আরো ৬ কিমি পরে পড়বে পাথর নাচুনী। তারপর চড়াই। ৩ কিমি চড়াই এর পরে কৈলু বিনায়ক (৪২৬৮ মি)। এখানে আছে বিশাল গনেশ মুর্তি (বিনায়ক গনেশের আর এক নাম) আরো কিছু পথে ব্রহ্ম কমলের রাজত্বে পৌঁছবেন। অর্থাৎ বগুয়া বাসায় (৪৪৫১ মি)। এখানে থাকার জন্য গুহা পাবেন। পঞ্চম দিনে ৫ কিমি শক্ত চড়াই ভেঙে পৌঁছন রূপকুন্ডে।

এবার সাবধানে তুষার পথ পার হয়ে আসুন জিওনারগলি গিরিপথে (৫০৬১ মি)। এখান থেকে কিমি উৎরাই পথে পৌঁছন শিলাসমুদ্র হিমবাহে।

যাঁরা অন্য পথে ফিরতে চান তাঁরা ৯ কিমি হেঁটে পৌঁছন হোমকুন্ডে (৪৩১৯ মি)। এখান থেকে ১৭ কিমি হাঁটলে পাবেন সুতল গ্রাম। এখানে তাঁবু খাটান। পরদিন ধর গ্রাম

পৌছে রাত কাটান। তার পরের দিন গুলোরীতে বিশ্রাম। পরের দিন ১২ কিমি হেঁটে পৌঁছন ঘাট। (১৩৩১ মি) এখান থেকে বাস বা জিপে নন্দপ্রয়াগ যেতে পারেন। কুমায়ুনে যাত্রা শুরু করে গাড়োয়ালে পৌঁছন।

নামিক হিমবাহঃ-

নামিক হিমবাহ অনেকেরই কাছে অজানা এবং খুব কম ট্রেকারই নামিক হিমবাহ অঞ্চলে ট্রেক করেছেন। অথচ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য , পিকচার পোস্টকার্ডের মত নৈসর্গিক দৃশ্য ইত্যাদি দিক থেকে এই অঞ্চল কোন হিমবাহ ট্রেকিং রুটের চেয়ে কম যায় না। নন্দাদেবী (৭৮৪৮ মি) নন্দাকোট (৬৮৬১ মি) ও ত্রিশূল (৭১২০ মি), গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের এই তিনটি বিখ্যাত তুষার শৃঙ্গ দিয়ে ঘেরা এই অঞ্চল। ট্রেকিং রুটে পড়বে গ্রাম ও মন্দির। নামিক হিমবাহ রামগঙ্গার উৎস।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্প : মুনসিয়ারী

	উচ্চতা	দূরত্ব	রাস্তা
	(মি)	(কিমি)	
কাঠগোদাম - মুনসিয়ারী	২২৯০ মি	২৯৬ কিমি	বাস
মুনসিয়ারী - ধলডাউক - সুদামখান	৪২৬৮ মি	১৮ কিমি	হাঁটা
সুদামখান - হিরামানি হিমবাহ	৪১০০ মি	৯ কিমি	,,
হিরামানি - নামিক হিমবাহ - সুদামখান		১৪ কিমি	,,
সুদামখান - নামিক গ্রাম	২০০০ মি	১১ কিমি	,,
নামিক গ্রাম - গোগিলা		৬ কিমি	,,
গোগিলা - লেতি	২০৫০ মি	১৯ কিমি	,,
লেতি - বাগেশ্বর		৫০ কিমি	বাস

কাঠগোদাম থেকে চৌকরী হয়ে মুনসিয়ারী আসুন। চৌকরী (২০১০ মি) তে একরাত কাটাতে পারেন। চৌকরী থেকে হিমালয়ের তুষারাবৃত পর্বতের অনুপম দৃশ্য দেখে আনন্দ পাবেন। বাড়তি লাভের মধ্যে আছে চা বাগানের দৃশ্য। থাকার জন্য বাংলো আছে। মুনসিয়ারী (সোনার গাড়) থেকে ধলডাউক সোজা ট্রেক। এখান থেকে পঞ্চচুলীর দৃশ্য চোখ ও মন তৃপ্ত করবে। এখান থেকে সুদামখান চড়াই এর পথ। সুদামখাল একটি বুগিয়াল বা তৃণভুমি। দ্বিতীয় দিন হাঁটার পর এখানেই তাঁবু খাটান। পরের দিন ৯ কিমি হেঁটে পৌঁছন হিরামানি হিমবাহে। এখানকার অনুপম প্রাকৃতিক দৃশ্য অবাক করে দেবে। হিরামনির কাছে

কয়েকটি হ্রদ দেখতে পাবেন। তৃতীয় দিন ট্রেকিং এর পর বিশ্রাম হবে এখানে। চতুর্থ দিনে হিরামানি থেকে নামিক হিমবাহ দেখে সুদামখানে আবার ফিরে আসুন। ট্রেকিং এর পঞ্চম দিনে সুদামখান থেকে নামিকগ্রাম হয়ে গোগিলাতে চলে আসুন। নামিকে ইচ্ছে হলে একরাত থাকতে পারেন। নামিক গ্রাম খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে। ভারত ও তিব্বতের ট্রেড রুটের অন্যতম কেন্দ্র ছিল নামিক। গোগিলা রামগঙ্গা উপত্যকার মাঝখানে অবস্থিত। গোগিলা থেকে লেতি লম্বা কিন্তু সহজ পথ। লেতি থেকে জিপ বা গাড়িতে বাগেশ্বর হয়ে কাঠগোদাম চলে যেতে পারেন। তবে যাঁরা এর আগে বাগেশ্বর দেখেননি সময় হাতে থাকলে বাগেশ্বরে একদিন থেকে যেতে পারেন, সরযু ও গোমতীর সঙ্গম স্থলে থাকতে ভালই লাগবে।

কুমায়ুনের অন্যান্য হিমবাহঃ-

কালাবালান্দ হিমবাহের কথা আগেই বলা হয়েছে। এটি রালাম উপত্যকায় অবস্থিত। রালাম হিমবাহের জন্য মোট ৫০ কিমি হাঁটতে হবে। কালাবালান্দ রালামে এসে মিশেছে। এটির অনুপম সৌন্দর্য্য মোহিত করবে ট্রেকারদের।

পঞ্চচুলিঃ- এই হিমবাহটি পিথোরাগড় জেলার দারমা উপত্যকায় অবস্থিত। ধরচুলার সোবলা থেকে ট্রেকিং রুট আছে। সোবলা আলমোড়া থেকে ২৭০ কিমি দূরে। বাসে বা জীপে করে আসা যায়। হিমবাহের স্নাউটের উচ্চতা ৪২০০মি। ট্রেকিং রুট অপেক্ষাকৃত সহজ। দুগতু এবং সাইলা গ্রাম চলার পথে পড়বে। গ্রাম দুটি ট্রেকারদের খুবই ভাল লাগবে। মোট ট্রেকিং ৮-১০ দিনের মত।

ছবিঃ সংগৃহীত

কম্বোডিয়া

উমা ভট্টাচার্য

সঙ্গের ছবিটি দেখো। খালি হাতে একটা মাইন খুঁড়ে তুলছে একটা ছেলে।সাধারণ দেখতে এই অসাধারণ ছেলেটার নাম আ কিরা। গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর তার জীবনকাহিনী–

মাত্রই কয়েক দশক আগে তার দেশকে একজন হিংস্র মানুষ শাসণ করত। তার নাম পল পট আর তার দলের নাম ছিল খেমের রুজ। সারা দেশে মাইন পুঁতে, গুলি ছুঁড়ে, ইস্কুলবাড়ির মধ্যে জেলখানা গড়ে, ভীষণ অত্যাচার করে সে নিজের দেশের লোকদেরই মারত। ছোট ছোট ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে সে তার খুনে সৈন্যের দলে ভর্তি করে নিত। আ কিরাকে যখন ধরে নিয়ে গিয়ে তার হাতে বন্দুক ধরিয়ে দেওয়া হয় ,সে তখন বন্দুকটার থেকেও লম্বায় খাটো। তারপর তাকে দিয়ে জোর করে গ্রামগঞ্জের মাঠে ,ধানক্ষেতে লোকালয়ের আশেপাশে প্রচুর মাইন পোঁতানো হয়। সেইসব মাইন ফেটে গিয়ে নিরীহ লোকেদের মরে যাওয়া, হাত পা খুইয়ে পঙ্গু হয়ে যাওয়া দেখে তার মন কাঁদত।

তারপর, একদিন ভালো লোকেরা যুদ্ধ করে পল পটকে হারিয়ে দিয়ে দেশে শান্তি ফেরালো। সারা দেশের মাটিতে তখনও আকিরার মতন মানুষদের হাতে পোঁতা বহু প্রাণঘাতি মাইন ছড়িয়ে আছে। আকিরা তখন কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে শুধু একটা লাঠি আর একটা ছুরি নিয়ে মাটি খুঁড়ে সেইসব মাইন তুলে নিষ্ক্রিয় করতে লাগলো, আর তার খোলগুলো জমাতে লাগল । পরে সেগুলো দিয়ে সে একটা মাইনের জাদুঘর গড়ে তুললো। সামান্য দামের টিকিটের বিনিময়ে সেগুলো লোককে দেখিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ঘৃণা তৈরির জন্য নীরবে যুদ্ধ শুরু করলো। আর এই টিকিট বিক্রির টাকায় সে গড়ে তুললো এক উদ্ধারগ্রাম। সারা দেশে তখনো ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মাইনের ঘায়ে আহত পঙ্গু ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকতে পায়, খেতে পায়, খেলাধুলার সুযোগ পায় , পড়াশুনা শেখার সুযোগ পায়, স্কুলে যেতে পায়। আজ

পর্যন্ত প্রচুর জমি মাইন মুক্ত করে বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য করে তুলেছে এই একাকি যোদ্ধা আ কিরা।

পুরনো কালের কথাঃ

আ কিরা যে দেশের মানুষ তার নাম কম্বোডিয়া, বা কাম্পুচিয়া, যার প্রাচীন নাম ছিল কম্বোজ। বাংলা একটি কবিতায় আছে ,

স্থপতি মোদের স্থাপন করেছে বরবুদরের ভিত্তি,
শ্যাম , কম্বোজ , অঙ্কোরথোম মোদেরই প্রাচীন কীর্তি

এই কবিতার লাইন দুটিতে রয়েছে দুটি দেশের নাম ও দুটি প্রাচীন বিখ্যাত স্থাপত্যের নাম, একটি বরবুদর যা ইন্দোনেশিয়াতে আর অন্যটি অঙ্কোরথোম যা কম্বোজ দেশে বা বর্তমান 'কিংডম অফ কম্বোডিয়া'তে অবস্থিত। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল, আর ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশগুলির সভ্যতা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, শিল্প স্থাপত্য, সমাজব্যবস্থা, সর্বোপরি ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক গভীর যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এর প্রমান পাওয়া যায় কম্বোডিয়ার অঙ্কোরভাট, অঙ্কোরথোম, তা প্রোম, বেয়ন,

বান্তেই স্রেই প্রভৃতি মন্দির গুলির স্থাপত্যরীতি, মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত দেবমুর্তির গঠন ও নাম,

মন্দিরের গ্যালারিগুলির দেওয়াল জুড়ে আঁকা নানা চিত্র, যুদ্ধের বিবরণ , জীবনযাত্রার চিত্র, এবং ভারতীয় রামায়ণ, মহাভারত, ও পুরাণের কাহিনী নিয়ে আঁকা নির্ভুল চিত্র বিবরণ থেকে। এমনকি প্রাচীন কালের রাজাদের নাম (জয়বর্মণ, সূর্যবর্মণ), জায়গার নাম (ঈশানপুরা, ইন্দ্রপথ), প্রভৃতি থেকেও প্রমাণিত হয় ভারতের সঙ্গে কত নিবিড় যোগাযোগ ছিল এদেশের।

কম্বোডিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোচীন উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। উত্তর পশ্চিম দিকে প্রাচীন কালের শ্যামদেশ, এখনকার থাইল্যান্ড, উত্তর-পুর্ব দিকে লাওস, পূর্বদিকে ভিয়েতনাম, ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে থাইল্যান্ড উপসাগর দিয়ে ঘেরা। ছোট্ট দেশ।লোকসংখ্যা প্রায় ১৪.৮ লাখ। হীনযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই দেশ। ৯০ শতাংশ নাগরিক খেমের জনগোষ্ঠীর লোক।এছাড়া আছে ভিয়েতনামী, চীনা, ও চাম জাতির মানুষ। এই চাম হচ্ছে মধ্য ভিয়েতনামের লোক, যার প্রাচীন নাম ছিল চম্পাদেশ। এছাড়াও আছে ৩০টি বিভিন্ন পার্বত্য জনজাতি - যাদের এখন নাম দেওয়া হয়েছে 'খেমের লউ'।

কম্বোডিয়ার রাজধানী ও দেশের বৃহত্তম শহর 'নোম-পেন', মেকং নদী ,টোনলে স্যাপ ও বাসাক নদীর ধার ঘেঁষে অবস্থিত।

খেমের মানুষরাই ছিল দঃ পঃ এশিয়ায় প্রথম বসবাসকারীদের মধ্যে অন্যতম। পণ্ডিতেরা মনে করেন খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ২০০০ সালের মধ্য দঃ পুঃ চীন থেকে ইন্দোচীন উপদ্বীপে এসে তারা বাসা করে।খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দি থেকে এই মানুষরা কম্বোডিয়ার প্রধান ভাষা— 'খেমের'-এর জন্ম দেয়। এদের মধ্যে অনেকে আবার পুরনো জায়গা ছেড়ে দলে দলে সমুদ্রের ধার বরাবর, ও মেকং নদীর ধারে ও মেকংয়ের বদ্বীপ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে।

ধীরে ধীরে এদের সঙ্গে বিদেশের ,প্রধানত নিকটবর্তী ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হল জলপথে। সেই সূত্রে প্রথমে ফুনান অঞ্চলে বিশাল এলাকা নিয়ে উন্নত রাজ্য গড়ে উঠেছিল । ব্যবসা বাণিজ্যের সুত্রেই প্রথমে এখানে ভারতীয় হিন্দু ধর্মের ও সংস্কৃতির ছাপ পড়তে শুরু করে। এখানকার কিছু মানুষ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে চেনলা অঞ্চলে চলে এসে ঘাঁটি গাড়ে। ধীরে ধীরে এরা মূল কম্বোডিয়ার সঙ্গে ভিয়েতনাম, লাওস ,ও থাইল্যান্ডের অনেক জায়গা দখল করে বিরাট রাজ্য গড়েছিলো।

কম্বোডিয়ার খেমের সুবর্ণ যুগ শুরু হয় নবম শতাব্দি থেকে চলে ত্রয়োদশ শতাব্দি পর্যন্ত। ৮০২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় জয়বর্মণ নামে এক রাজপুত্র জাভা থেকে এখানে চলে আসেন ও কুলেন পর্বত অঞ্চলে (নাম ছিল মহেন্দ্র পর্বত) রাজ্য স্থাপন করেন। নিজের রাজ্যাভিষেক করে 'রাজচক্রবর্তী' ঘোষণা করেন। দেশের রাজণ্যবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করে নিজের অধীনে এনে শক্তিশালী খেমের সাম্রাজ্য স্থাপন করেন,যা পরবর্তী কালের আংকোর সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন

করে। এই সময় থেকেই খেমের সাম্রাজ্য রাজনৈতিক,সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নত হয়ে ওঠে। রাজা ২য় জয়বর্মণ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী,কিন্তু আগেকার হিন্দু ধর্মের দেবতাদের পুজার কোনও বাধা ছিলনা, দুই ধর্মেরই সহাবস্থান ছিল।

পরবর্তী ২৩জন রাজার আমলে আঙ্কোরের খেমের সাম্রাজ্য নানা বিষয়ে চরম উন্নত হয়। সাম্রাজ্য বড় হতে থাকে। ২৪তম রাজা সপ্তম জয়বর্মণের সময় (১১৮১-১২১৮) সাম্রাজ্য উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে ওঠে। পরপর কয়েকটি যুদ্ধে তিনি, পাশাপাশি রাজ্যগুলো দখল করে নেন ,এমনকি নৌবলে বলীয়ান "চাম দের" শহরগুলো আক্রমণ ও লুঠ করেন।

তবে ভাগ্য সবসময় মানুষকে সঙ্গ দেয়না। "দিয়েত ভিয়েত" নামে একটা জায়গায় যুদ্ধে রাজার মৃত্যুর পর থেকে খেমের সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। দীর্ঘ যুদ্ধ, আন্তঃরাজ্য খারাপ সম্পর্কের ফলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। খেমেররা যে জটিল ও সমৃদ্ধ জলসঞ্চয় ব্যবস্থা ও জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তা ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়, ফলে উন্নত কৃষিব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত কমতে থাকে।

এরপর থেকে দীর্ঘদিন ধরে থাই ও ভিয়েতনামীরা বারবার দেশটাকে দখল করেছে। ঊনিশ শতকে এসে কম্বোডিয়া চলে যায় ফরাসিদের দখলে। তারপর, তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই করে ১৯৫৩ সালে দেশকে স্বাধীন করেন রাজা নরোদম সিহানুক। তাঁর অধীনে দেশে এক সাংবিধানিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৯৫৫ সালে সিহানুক রাজনীতিতে যোগ দিয়ে নির্বাচনে জিতে প্রধানমন্ত্রী হন। কিছুকাল বাদে সামরিক অভ্যুত্থানে সিহানুক গদিচ্যুত হলে শুরু হয় এক ভয়ানক গৃহযুদ্ধ। শেষমেষ ভিয়েতনামীদের সাহায্যে কম্বোডিয়ায় "খেমের রুজ" নামে এক হিংস্র দলের শাসন প্রতিষ্ঠা হল যার খেসারত দিতে হল দেশবাসীকে। ওদিকে তখন ভিয়েতনামের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ লেগেছে। দুপক্ষের

যুদ্ধ অনেকসময়েই কাম্বোডিয়ার মাটিতে ঘটছিলো। সব মিলিয়ে, একদিকে খেমের রুজদের অত্যাচার, অন্যদিকে গৃহযুদ্ধ আর সব ছাপিয়ে আমেরিকার ঘন ঘন বোমারু বিমানের হামলায় দলে দলে লোক মরতে লাগলো। যারা পারলো তারা পালিয়ে যেতে লাগলো শরণার্থী হয়ে।

১৯৭৫ এ ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হবার পর কম্বোডিয়ায় খেমের রুজদের রাজত্ব পুরোপুরি শুরু হল ,যা চলল পুরো পাঁচ বছর। তারা বলত, পশ্চিমের যা কিছু আছে সব খারাপ। সেইসব পালটে ফেলতে হবে। সেই পাল্টাবার মূল কায়দাটা এদের কাছে ছিল সবকিছু ধ্বংস করে ফেলা। এদের তাণ্ডবে ধ্বংস হয়ে গেল দেশের ইশকুল, কলেজ, অফিস-কাছারি, ব্যবসা বাণিজ্য, সবকিছু। দলে দলে মাস্টারমশাই, পেশাদার চাকুরিজীবি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, আইনজীবী, ডাক্তার আর মেধাবী ছাত্রদের ধরে ধরে মেরে ফেলত এরা। কি ভয়াবহ ছিল এই খেমের রুজের দল তার খবর তো ওপরে আ কিরার জীবনী থেকেই বুঝতে পেরেছো।

এরপর যখন খেমের রুজরা ভিয়েতনাম আক্রমণ করলো, তখন ১৯৭৮ এর নভেম্বরে ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী কম্বোডিয়ায় ঢুকে আক্রমণ চালিয়ে খেমের রুজদের তাড়িয়ে দিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো কম্বোডিয়ার লোকজন। ১৯৮১ সালে "কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট অফ ডেমোক্রেটিক কাম্পুচিয়া"গঠিত হল। নরোদম সিহানুক আবার কম্বোডিয়ার রাজা হলেন। ১৯৯৩ সালে তৈরি জাতীয় সংবিধান অনুযায়ী এখন দেশটা চলে।

রোজগারপাতিঃ

এদেশের বেশির ভাগ মানুষই চাষী। দেশে শিল্প বলতে বস্ত্রশিল্প আর পর্যটনশিল্প। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হচ্ছে চাল,কাঠ, রাবার ও কিছু কাপড়চোপড়। এ দেশে কোন বিদ্যুতকেন্দ্র নেই। জেনারেটার সেট দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। ধানটুকুও ভাঙাতে পাঠাতে হয় ভিয়েতনামে। চিন, জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া এইসব দেশ মিলে এখানকার সব ব্যবসা বাণিজ্য টাণিজ্য সামলায়।

পুজোআর্চা

বিভিন্ন ছোট বড় মন্দিরে সন্ধ্যাবেলায় পুজো আরতি হয়। পুজোর ডালি তৈরি হয় একটি ডাবের মুখ পাতলা করে চেঁছে তার মুখটিতে ডাঁটাসমেত পদ্মফুল ও ধুপকাঠি গুঁজে তাতে বেল ফুলের মালা জড়িয়ে। যে কেউ কিনে পুজো দিতে পারে। কারোর হাতে আধখানা ডাবের খোলার মধ্যে মোমবাতি বসানো। আরতির সময় জলতরঙ্গের মত সুর তোলা খেমের বাদ্যযন্ত্র ও ঢোল বাজে।

নাচগানঃ

এদেশের বিখ্যাত নাচের নাম "চুন পাও" নামে অপ্সরা নৃত্য। নাচের পোশাক হল উপরে নানা রঙের সোনালী সুতোর কাজ করা ঝকমকে ব্লাউজ,নীচে কোমরবন্ধনী দিয়ে এঁটে সুন্দর টাইট করে গুছিয়ে পরা কাপড়। সঙ্গে বাদকেরা থাকে "ক্ষম থোম" নামে লম্বা বাঁশি, "রনিয়াত" নামে দেশীয় জাইলোফোন , আর "ক্রাগেউ" নামে তারবাদ্যযন্ত্র নিয়ে। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন জায়গায় পর্যটকদের জন্য নৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

পোশাক-আশাকঃ

মেয়েরা পরে ব্লাউজ, লুঙ্গি। ছেলেরা পরে শার্ট ও লুঙ্গি। মেয়েদের পোশাকের একটা বিশেষ অংশ হচ্ছে "ক্রামা"নামে একরকম চেককাটা স্কার্ফ ,যা দেখে এদের খেমের বলে চেনা যায়। খেমের রুজদের আমলে সব সমতলবাসী খেমেরদের আলাদা করে চেনার জন্য এই চেককাটা স্কার্ফ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

জলহাওয়াঃ

এদেশের গরমকাল নভেম্বর থেকে এপ্রিল- মে মাস পর্যন্ত শুকনোর সময় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ওপরে উঠে যায় ,আর জুন মাস থেকে শুরু হয় প্রবল বর্ষণ।তাপমাত্রা নেমে যায় ২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এর নিচে। প্রতি বছরই বন্যা হয় , বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নিচু জমি প্লাবিত

হয়। এই কারণেই এখানকার বাড়ির ঘরগুলি মাটি থেকে ৩ / ৪ ফুট উপরে কাঠের ৬টি বা ৮টি খুঁটির উপরে তৈরি করা হয়।

টোনলে স্যাপ আর চাকতোমুখঃ

কম্বোডিয়ার প্রানভোমরা টোনলে স্যাপ একটি বৃহৎ স্বাদুজলের হ্রদ যা দেশটিকে সুজলা সুফলা রেখেছে, এর চার দিকে গভীর বন। বনভুমিতে আছে হাজারের ওপর বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু। হ্রদের সঙ্গে যোগ রয়েছে পৃথিবীর দ্বাদশ দীর্ঘতম নদী মেকং-এর। (স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন, মেকং হল মা গঙ্গা শব্দটার আরেক রূপ)। গরমকালে টোনলে স্যাপের থেকে জল বেরিয়ে মেকং দিয়ে বয়ে যায়। তখন হ্রদ শুকিয়ে হয়ে যায় ২৭০০ বর্গকিলোমিটার। আর বর্ষাকালে ঘটে ঠিক তার উল্টোটা। তখন নদীর জল উজিয়ে এসে ঢুকতে থাকে হ্রদের ভেতর। হ্রদও আয়তনে বেড়ে হয়ে যায় ১৬০০০ বর্গকিলোমিটার। তিনটে নদী—টোনলে স্যাপ, বাসাক আর মেকং--এসে মিশেছে কম্বোডিয়ার রাজধানী নম পেন-এর কাছে। এমনভাবে আড়াআড়িভাবে নদী গুলি নিজেদের কেটে বেড়িয়ে গেছে X অক্ষরের মত, তাই এই জায়গাটির নাম চাকতোমুখ, যা চতুর্মুখ এর অপভ্রংশ বলে মনে হয়।

খাওয়াদাওয়াঃ

খেমেররা ভাতই বেশি খায়। রাস্তার ধারের স্ন্যাক্সের দোকানেও ভাত, কড়া করে ভাজা চালের পিঠে, রাইস ন্যুডল স্যু প, রাইস পরিজ এসব পাওয়া যায়। স্যালাড থাকেই। এছাড়া ডাব- চিকেনও পাওয়া যায় খাবারের দোকানে। ডাবশুদ্ধুই তা পরিবেশন করা হয়। ফলের মধ্যে আছে “দুরিয়ান”, যাকে এরা বলে ফলের রাজা। এছাড়া আছে আম, কলা,তরমুজ, রামবুটান, পেঁপে, আনার্ স্টার আপেল ইত্যাদি। শীতকালে বাঁশের কোঁড়,বাঁধাকপি, স্কোয়াশ, মটরশুঁটি ও মোচা পাওয়া যায়। এদের একটা বিশেষ পদ হচ্ছে “আমোক”। ভাপানো ক্যাটফিশ দিয়ে নারকেলের কারি। মাছভাজাও প্রিয় খাদ্য। তাছাড়া পথের পাশে আখছার স্ন্যাকস হিসেবে মিলবে মাকড়শা ভাজা, ঝিঁঝিপোকা ভাজা আর কোয়েলের ডিম।

ছবিঃ লেখিকা ও সংগৃহীত

ক্লারা বার্টন

উমা ভট্টাচার্য

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল যুদ্ধকালীন সেবিকার কাজের জন্য "লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প" আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন, সে তো আমরা জানি। তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন করে রাতের বেলাতেও আলো হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতেন; যদি কোনও সৈনিক আহত অবস্থায় জীবিত থেকে থাকেন, যদি তার জীবন বাঁচানো যায়, এমনি ছিল তাঁর মানুষের জন্য দরদ।

এই রকমই আর একজন হলেন মিস ক্লারা বার্টন- যুদ্ধক্ষেত্রের দেবদূত নামে যিনি পরিচিত ছিলেন সৈনিকদের কাছে। তবে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত। শিক্ষিকা, মানবাধিকার কর্মী, মিলিটারি হাসপাতালের সেবিকা, কৃষ্ণাঙ্গদের ও মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নেতা, আর সর্বোপরি, আমেরিকান রেডক্রস অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাত্রী।

জন্ম ১৮২১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বের। আমেরিকার নর্থ অক্সফোর্ডের এক গণ্যমান্য চাষী পরিবারের ছোট মেয়ে। পুরো নাম ক্লারা হারলট বার্টন। বাবা ক্যাপ্টেন স্টিফেন বার্টন ছিলেন প্রাক্তন সেনা, কৃষক ও সফল অশ্ব ব্যবসায়ী। মা ছিলেন সারা বার্টন।

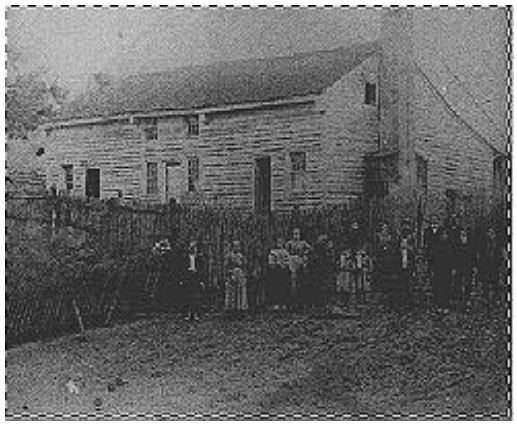

ক্লারার জন্মস্থান

লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধুলা, ঘোড়ায় চড়া সবই খুব মন দিয়ে শিখছিলেন ক্লারা। বড় হয়ে শিক্ষিকা হওয়ার ইচ্ছা ছিল। স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি পড়তে শুরু করেন দর্শনশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা, ও ল্যাটিন ভাষা।

ছোট বেলায় বাবার কাছে যুদ্ধক্ষেত্রের গল্প , সেনাদের দেশপ্রেম আর বীরত্বের গল্প, যুদ্ধে তাদের আহত হয়ে দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়া, ত্রাণের অভাবে, সেবার অভাবে কষ্ট পাওয়ার কথা, মৃতদের খুঁজে না পাওয়ার কথা, তাদের আত্মীয়দের অসহায়তার কথা শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে

ক্লারার মনে সামরিক বিষয়ে সারাজীবনব্যাপী একটা আকর্ষণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে তৈরি হয়ে গিয়েছিল এক সেবার মনোবৃত্তি।

একবার হল কি, তার দাদা ডেভিড গোলাবাড়ির চাল সারাতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে বেজায় চোট পেল। ডাক্তাররা ডেভিডের ভালো হয়ে ওঠার আশা ছেড়ে দিলেন। আশা ছাড়লো না শুধু ১১ বছরের ক্লারা। সব কাজ ছেড়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় দাদার সেবা করে ডাক্তারদের ধারণা ভুল প্রমান করে ভালো করে তুললো দাদাকে। ডাক্তাররা তো অবাক,তাঁরা ব্যাপারটাকে "মিরাকল" আখ্যা দিলেন। এমনিভাবেই ক্লারার আজীবন সেবার কাজের হাতেখড়ি। এমনই ছিল তাঁর একরোখা, দৃঢ় মনোভাব,সারা জীবনই তাঁর কাজের মধ্যেও এর প্রতিফলনই ঘটেছিল। যা একবার করবেন বলে ঠিক করেছেন, যা মানুষের কল্যানে লাগবে ভেবেছেন তা তিনি করেই ছেড়েছেন চিরকাল।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে ক্লারা ম্যাসাচুসেটসের ওরসিস্টার কান্ট্রি স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি পান। ১০ বছর চাকরি করার পর আরও পড়াশোনা করার জন্য "অ্যান আডভান্স স্কুল ফর ফিমেল টিচার্স" এ ভর্তি হন। এখানে থাকতেই ফরাসি ভাষা শিখতে শুরু করেন ও পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। এখানকার পড়া শেষ করে নিউ জার্সি চলে যান একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে। নিউজার্সির বরডেনটাউনে ক্লারা নিজে একটি অবৈতনিক স্কুল খুললেন,এবং ছাত্রসংখ্যাও শীঘ্রই ৬০০ ছাড়িয়ে গেলো। এই সময়ই স্কুলবোর্ড একজন মহিলাকে প্রধানের পদে উচ্চ বেতনে না রেখে একজন পুরুষ শিক্ষককে সেই পদে বসানোর সিদ্ধান্ত নিলে তার প্রতিবাদে কাজ ছেড়ে ওয়াশিংটন ডি সি তে ফিরে এলেন ক্লারা। যোগ দিলেন পেটেন্ট অফিসে পেটেন্ট কমিশনারের পদে। আমেরিকার ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি পেটেন্ট কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এখানেও দেখা দিল সেই একই সমস্যা। এমন একটা উঁচু পদে একজন সামান্য মহিলা একজন পুরুষ সহকর্মীর সমান বেতনে কাজ করবেন এটা অনেকের মনঃপূত হলনা, রাজনৈতিক চাপে তাঁকে কমিশনার থেকে একেবারে কেরানির পদে নামিয়ে দেয়া হল।

এর একটা কারণ হয়তো এই যে, ক্লারা বার্টন ছিলেন ক্রীতদাস প্রথার বিরোধী আর পেটেন্ট অফিসের কর্তাব্যক্তিরা ছিলেন দাসপ্রথার পক্ষপাতী। ১৮৫৭-১৮৬০ পর্যন্ত এই অফিসে কাজ করার পরে তিনি ওয়াশিংটন ছেড়ে যান।

ইতিমধ্যে ১৮৬১ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হল। ক্লারা বার্টন কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুদ্ধের ফ্রন্টে তাঁর কাজ শুরু করলেন। যুদ্ধে আহত, বিধ্বস্ত সেনাদের সেবাই তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। হাতের কাছে খাদ্য ,তুলো, ব্যান্ডেজ, তোয়ালে ,রান্নার জ্বালানি কিছুই ছিলোনা। তবুও তিনি সামান্য যা তাঁর নিজের ছিল ,আর কিছু নাগরিকদের কাছে চেয়েচিন্তে তা দিয়ে আহতদের সেবার কাজে হাত লাগালেন। পুরনো চাদর ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতেন, বড় টুকরো করে তোয়ালে হিসেবে ব্যবহার করতে দিতেন, অবশিষ্ট অব্যবহার্য অংশ রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতেন।

সেইসঙ্গে দিকে দিকে তিনি ত্রানসামগ্রীর জন্য সাধারণ জনগণের কাছে আবেদন রাখতে শুরু করলেন। বিখ্যাত "প্রথম বুল রান" যুদ্ধের পর সৈন্যদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবের বিষয়ে বিশেষ রিপোর্ট পেয়ে তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যুদ্ধে আহত সেনাদের ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য মানুষের কাছে আবেদন রাখলেন। সে সাহায্য অর্থ হতে পারে, দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী, সোয়েটার মোজা, টুপি , পোশাক যা কিছু হতে পারে, সবই কাজে লাগবে। তাঁর এই আকুল আবেদনের ফল মিলল হাতে হাতে। চারদিক থেকে এত সাহায্য আসতে শুরু করলো যে তা ঠিকভাবে রাখা ও বিতরণের জন্য সঙ্গীদের নিয়ে তিনি একটা সংস্থা খুললেন। প্রমাণ হল, মানুষের সেবার কাজের জন্য কখনো অর্থের অভাব হয়না। শুধু দরকার আন্তরিক ইচ্ছা ও সুযোগ খুঁজে নেওয়ার। স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে আহত সেনাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, ওষুধ ,ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস যথাসাধ্য জোগাতে লাগলেন তিনি এইবারে। দরকারে নিজের হাতে তাদের শুশ্রূষাও করতেন।কাজটা করতেন তিনি কোন সরকারি সাহায্য ছাড়াই। একবার এরকম এক সেনাকে ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় একটি গুলি এসে তাঁর জামার হাতায় লাগে। একটুর জন্য তিনি বেঁচে যান। তবুও তিনি কোনও দিন ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া বন্ধ করেননি।

আহত সেনাদের সাহায্য সেবা দিয়েই থেমে থাকেননি ক্লারা। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ঠিকানাহীন সেনাদের পড়ে থাকতে দেখে তিনি এর পর শুরু করলেন নতুন অভিযান। মৃত ও নিখোঁজ

সেনাদের খবর খুঁজে বার করে,আত্মীয়দের কাছে পৌঁছোবার কাজ শুরু হল। যুদ্ধ শেষে প্রেসিডেন্টের নির্দেশে ক্লারা একটি "হারানো মানুষের দপ্তর" খোলেন। এইখানে তিনি হারানো সেনাদের খুঁজে পাওয়ার জন্য এক অভিনব কায়দা তৈরি করলেন। সেটা হল চিঠি লেখা অভিযান। উত্তরে তাঁর কাছে হারানো স্বজনদের খুঁজে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রচুর আবেদনপত্র আসতে লাগলো। গৃহযুদ্ধের সময় জর্জিয়াতে ইউনিয়ন পক্ষের যে সব সেনা বন্দি ছিলেন ও যাঁরা বন্দি অবস্থায় মারা যান তাঁদের নামের একটা তালিকা নিয়ে যুদ্ধশেষে এক যুদ্ধবন্দী ক্লারা বার্টনের কাছে আসেন। সরেজমিনে তদন্ত করতে তিনি নিজেই জর্জিয়া যান ও ইউনিয়ন পক্ষের হাজার হাজার মৃত সেনার অচিহ্নিত গণকবর খুঁজে বার করেন। তাঁর অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে ৪৫০০০ সেনা সেই ক্যাম্পে বন্দি ছিলেন। তার মধ্যে প্রায় ১৩০০০ সেনা তীব্র শীতে,অসুখে ও খিদেয় মারা গিয়েছিলেন।বার্টন সেইসব হতভাগ্য সেনাদের নামের তালিকা খবরের কাগজে ছাপতে থাকেন । এর ফলে অনেক পরিবার তাদের হারানো মানুষের খোঁজ পেল।এইবারে হারানো স্বজনের খোঁজ চেয়ে আরও চিঠি আসতে লাগলো তাঁর কাছে। অক্লান্ত ক্লারাও নানা উপায়ে এদের খোঁজ করতে লাগলেন। ঐতিহাসিকরা বলছেন মিস বার্টনের একক চেষ্টাতেই ১৮৬৭ সালে এই অফিস বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তিনি ৬৩,১৮৩ জনের চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন আর প্রায় ২২,০০০ হারানো মানুষের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। তিনি সকল কাজের সঙ্গে বিভিন্ন যায়গায় যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতাও দিতেন।

সেনাদের খোঁজে গিয়ে তাদের মা, স্ত্রী, ও ছেলেমেয়েদের অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করেন, তাই তাদের সুরক্ষার ও অধিকারের জন্য সরব হন, ও "মেয়েদের অধিকারের সংগঠন" তৈরি করেন, সঙ্গে তাদের ভোটাধিকার এর সপক্ষে আওয়াজ তোলেন।

অপরিসীম পরিশ্রমে ক্লান্ত ক্লারাকে যুদ্ধের শেষে ডাক্তারের নির্দেশে স্বাস্থ্যের কারণে ইউরোপ যেতে হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি জড়িয়ে পড়লেন আর এক যুগান্তকারী কাজের সঙ্গে। ইউরোপে থাকার সময় ফ্রান্স ও জার্মানির সংঘর্ষের সময় তিনি জড়িয়ে পড়লেন ত্রাণকার্যে, আর খুব কাছে থেকে দেখলেন জেনিভা চুক্তির উপকারিতা আর আন্তর্জাতিক সেবাসংস্থা রেড ক্রসের কাজ।

শরীর ঠিক হতে আমেরিকায় রেডক্রস প্রতিষ্ঠা করার ও জেনেভা চুক্তিতে আমেরিকাকে সই করানর প্রতিজ্ঞা নিয়ে দেশে ফিরলেন ক্লারা। দেশে ফিরে লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে ১৮৮১ সালে আমেরিকায় "দি ন্যাশনাল সোসাইটি অফ রেড ক্রস" গঠন করেন এবং আমেরিকা ১৮৮২ সালে জেনেভা চুক্তিতে সই করে।পরে জন রকফেলার ও অন্য ৪ জনের আর্থিক অনুদানে ও ফেডারেল গভর্নমেন্ট অনুমোদন এবং অর্থসাহায্য দিলে হোয়াইট হাউসের খুব কাছেই রেড

ক্রসের সদর অফিস তৈরি হয়। শুরু থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ক্লারা বার্টনই রেড ক্রসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

রেড ক্রসের কাজের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করেছিলেন ক্লারা। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও নিহতদের সাহায্য করা ছাড়াও শান্তির সময়েও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দেওয়ার রীতি তিনি প্রবর্তন

আমেরিকান রেডক্রসের প্রতিষ্ঠা

করেন। এছাড়া খরা, বন্যা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়, আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ, সামাজিক,রাজনৈতিক আশান্তির সময়ও সাধারণ মানুষের রক্ষার ব্যাপারেও রেড ক্রস সাহায্য করবে এই নীতি চালু করেন। এর জন্য আমেরিকার রেড ক্রসের আইনের রদবদলও করা হয়। তাঁর কার্যকালে রেড ক্রসের কার্যাবলী আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের ইতিহাসে আমেরিকাকে "গুড সামারিটান অফ নেশনস" আখ্যায় ভূষিত করে।

তাঁর তত্বাবধানে ১৮৮১ সালেই ৪ঠা সেপ্টেম্বর অসামরিক ক্ষেত্রে ত্রাণ পাঠানো হয় মিশিগানের ভয়ঙ্কর দাবানলে ক্ষতিগ্রস্থ ৫০০০ এর উপর মানুষকে।দ্বিতীয়বার ত্রাণ পাঠানো হয় ১৮৮৯ সালে ৩১ শে মে আমেরিকার জন্সটাউনের বন্যাকবলিত অঞ্চলে। তৃতীয়বার অসামরিক ক্ষেত্রে ত্রাণ পাঠান ১৮৯৩ সালের ২৭ শে আগস্ট সাউথ ক্যারোলিনার সমুদ্রের দ্বীপগুলিতে। ভয়ানক হারিকেনের কবলে এখানে প্রায় ৩০,০০০ মানুষ গৃহহারা হয়েছিলেন। এঁরা প্রধানত আফ্রিকান-আমেরিকান কালো মানুষ ছিলেন।

এখানেই শেষ নয়। ১৮৯৮ সালের ২০ জুন স্প্যানিশ আমেরিকান যুদ্ধের ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য ত্রাণ ভর্তি জাহাজ নিয়ে কিউবার হাভানাতে নিজে চলে যান ক্লারা।তখন তাঁর বয়স সত্তরেরও বেশি। শেষবারের মত ত্রানসামগ্রী নিয়ে ১৯০০ সালে টেক্সাস এর গ্যাল্ভান্সটোনের হ্যারিকেন ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্থদের যখন সেবা করতে যান তিনি তখন তাঁর বয়স ৭৯।

১৯০৪ সালে তিনি রেড ক্রসের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ইস্তফা দেন। এর পর মেরিল্যান্ডে গ্লিন ইকো তে নিজের বাস ভবনে আরো আট বছর কর্মক্ষম অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। ১৯১২ সালের ১২ই এপ্রিল সামান্য অসুখে মারা যান ক্লারা।

তিনি যে সব বই লিখেছেন সেগুলি হল,"হিস্ট্রি অফ দি রেড ক্রস","দি রেড ক্রস ইন ওয়ার এন্ড পিস", "দি স্টোরি অফ মাই চাইল্ডহুড"।

১৯৭৫ সালে তাঁকে সম্মান জানাতে "ক্লারা বার্টন ন্যাশনাল হিস্টরিক সাইট" স্থাপিত হয় তাঁর মেরিল্যান্ডের বাড়িতে। আমেরিকায় কোন মহিলাকে এমন সম্মান দেখানো সেই প্রথম। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস পত্রিকা তাঁর সঠিক মুল্যায়ন করে লিখেছিল "বর্তমান কালের যুদ্ধ আর যোদ্ধারা জেনেছে তিনি (ক্লারা বার্টন) একমাত্র তিনিই ছিলেন ক্ষমা ও করুণার সম্পূর্ণ প্রতিমূর্তি"।

রেড ক্রস কী?---- রেড ক্রস একটি নিরপেক্ষ ,স্বাধীন ,স্বেচ্ছাসেবী ,সাহায্যকারী সংস্থা। এই সংগঠনের কর্মকাণ্ডের খরচ চলে জনগণের স্বেচ্ছা দানের টাকায়। প্রথম আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের প্রতিষ্ঠা হয় সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে। হেনরি ডুনান্ট নামে একজন সুইস ব্যবসায়ী ইটালিতে সলফেরিনোর যুদ্ধের সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় কাছে থেকে যুদ্ধের বীভৎসতাকে দেখেন ও বিচলিত হয়ে পড়েন আহত ও নিহত সেনাদের করুণ অবস্থা দেখ স্থানীয় মানুষজনকে সংগঠিত করে সেখানে সাহায্যের ব্যবস্থা করেন।তখনি তিনি এবিষয়ে ভাবনা শুরু করেন,ও দেশে ফিরে এই যুদ্ধের বিবরণ দিয়ে একটি বই লেখেন। তাঁর লেখা খুবই সাড়া জাগায় দেশে। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত সেনাদের ত্রাণের জন্য একটি নিরপেক্ষ সংগঠনের প্রয়োজন। এই সংগঠনের কাজকর্ম ঠিক করা ,কীভাবে চলবে সে সব আলোচনা ও কর্মপদ্ধতি এসব ঠিক করার জন্য বিভিন্ন দেশকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির সুপারিশ করেন, সেই অনুযায়ী ১৮৬৪ তে জেনেভা চুক্তি সাক্ষরিত হয়। কিন্তু তার আগেই সাহায্যকারী সংস্থা আন্তর্জাতিক রেড ক্রস গঠিত হয়ে যায় সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে। তাঁর এই জনহিতকর মৌলিক কাজের জন্য ১৯০১ সালে ডুনান্ট যুগ্মভাবে প্রথম নোবেল শান্তি পুরষ্কার পেয়েছিলেন।

জেনেভা কনভেনশন=১৮৬৩ সালের ৮ই আগস্ট পৃথিবী ১২ টি দেশ ,যুদ্ধের সময় যে কোনও দেশে ক্ষতিগ্রস্ত সেনাদের ত্রান সাহায্য পাঠানো ,আহতদের সাহায্য পাঠানো ,আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা , নিহতদের খুঁজে বের করে তাদের সঠিক সৎকারের ব্যবস্থা করা,বা আত্মীয়দের হাতে তাদের দেহ তুলে দেওয়া, রেড ক্রস কীভাবে স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে কাজ করবে, টাকাপয়সা কীভাবে আসবে, এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি চুক্তি হয় সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে।